সপ্তপর্ণ

॥ সাতটি ছোট গল্প ॥

কিরণশঙ্কর রায়

কে. এস্. মুখোপাধ্যায়
৬-১-এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন,
কলিকাতা—১২

প্রকাশক—
কে. এল্. মুখোপাধ্যায়
৬-১-এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন,
কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় মুদ্রণ—১৯৫৬
তিন টাকা

মুদ্রক—শ্রীভুবনমোহন বসাক
সিটি প্রিণ্টার্স
৩৫নং ছাতাওয়ালা গলি,
কলিকাতা-১২

"I have spread my dreams under your feet ;
Tread softly because you tread on my dreams.'

ভূমিকা

কিরণশঙ্কর রায় রাজনীতি ক্ষেত্রের বিচক্ষণ নেতা বলেই সাধারণের কাছে সুপরিচিত। কিন্তু বাংলা দেশের পাঠক ও সাহিত্যরসিকদের কাছে তাঁর আর একটি বিশিষ্ট পরিচয় ছিল—সেটি হচ্ছে "সুসাহিত্যিক কিরণশঙ্কর রায়।" ঘরোয়া বন্ধু-সভায় কিরণশঙ্করের জুড়ি ছিল না, ইংরাজি বাংলা কাব্যের আলোচনায়, —কবিতা আবৃত্তির উপযোগী এমন মধুর কণ্ঠও কদাচ কখনো শোনা যায়। ১৯২১ সাল থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আমার ছিল, বন্ধুত্বের সেটা বহিরঙ্গ মাত্র, কিন্তু অন্তরঙ্গে যে গভীর প্রীতি তাঁর ছিল সেটা সাহিত্যিক সুলভ বন্ধু প্রীতি। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল বাকপটুতা এবং আলাপ আলোচনার যে স্নিগ্ধ রসপরিবেশন সকলকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করত সেটা মূলতঃ সাহিত্যের রস।

অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট, প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক, ব্যারিষ্টার কিরণশঙ্কর যেদিন "সবুজ পত্র"এ লেখক হিসাবে দেখা দিলেন, সেদিন "চতুরঙ্গ", "ঘরে বাইরে", ও "চার-ইয়ারী কথার" যুগ। এতাবৎ কালের সাহিত্য যাচাইয়ের কষ্টিপাথর ধুয়ে মুছে সেদিন আসল ও মেকি সোনার দর কষাকষি চলছে; সেই কষ্টিপাথরে কিরণশঙ্করের "তারিখের শাসন" ও "ইতিহাসের ধারা" নিবন্ধ দু'টি খাটি সোনার মূল্যে বিদ্বজ্জন সমাজে সমাদর পেল। কিরণশঙ্কর লিখেছেন কম—কিন্তু যা লিখেছেন তা'থেকে ফেলবার কিছু নেই; সেগুলি সাহিত্যিক প্রচেষ্টা নয়, অধ্যবসায় সহকারেও তিনি কখনো

কিছু লেখেননি। কিরণশঙ্করের লেখায় আলস্য ছিল, কিন্তু পড়াশুনায় নয়। তিনি যখন যেটা লিখেছেন সেটা সাহিত্য হিসাবে উৎরে গেছে। রাজনীতির সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তাঁকে এইভাবে আত্মাহুতি দিতে না হলে সাহিত্যিক কিরণশঙ্করের কাছ থেকে বাংলা দেশ নিশ্চয় অনেক কিছু পেত। বাংলা দেশের রাজনীতিতে কিরণশঙ্কর তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধির জন্য যেমন অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, সাহিত্যক্ষেত্রেও তেমনি তাঁর খ্যাতি ও সম্মানের সমুচ্চ আসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারত ; —তার প্রমাণ আমরা পাই তাঁর লেখা একমাত্র গল্পের বই "সপ্তপর্ণ"তে।

বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন কয়েক বছর আগেই হয়েছিল। প্রথম সংস্করণটি যে নিঃশেষে ফুরিয়ে গিয়েছিল অল্পদিনের মধ্যে, তাতেই বইখানির জনপ্রিয়তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

রাজনীতিক কিরণশঙ্কর রায়ের সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ কি করে' রক্ষিত হয়ে এসেছে সেটার উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না।

অসহযোগ আন্দোলনে কংগ্রেসের নির্দেশে জাতীয় শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সৃষ্টি হ'ল গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনের এবং কলেজী শিক্ষার জন্য কলিকাতা বিদ্যাপীঠের। কিরণশঙ্কর ছিলেন একাধারে বিদ্যায়তনের কর্মসচিব এবং বিদ্যাপীঠের সাহিত্যের অধ্যাপক। বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র—এ যেন একটা ঐতিহাসিক যোগাযোগ। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থেকেও অধ্যাপনায় কিরণশঙ্কর সত্যই আনন্দ পেতেন। অধ্যাপনা ছাড়া আমাদের অর্থাৎ অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিয়ে ঘরোয়া বৈঠকে

সাহিত্যালোচনায় উৎসাহ ছিল তাঁর সমধিক। বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণও তাঁর নিবিড় সংস্পর্শে এসে তাঁর সাহিত্য-রসিক অন্তরের পরিচয় লাভ করেছিল। সাহিত্যের এই অনুরাগ এবং বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ও ছাত্রদের সঙ্গে এই অন্তরঙ্গতা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর মধ্যে অক্ষুণ্ণ দেখেছি ; দেখেছি এই প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গলাভের জন্য তাঁর আগ্রহের সীমা ছিল না।

তাঁর সেই প্রিয় ছাত্রগণ আজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপানর ব্যবস্থা করে তাঁকে সশ্রদ্ধ গুরুদক্ষিণা দিয়েছেন— এতে সত্যই আমি খুসি হয়েছি। কলিকাতা বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ সকলেই প্রায় আজ তাঁদের জীবনে অল্পাধিক প্রতিষ্ঠিত। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি তা' দেখেও গেছেন।

"সপ্তপর্ণ"এর গল্পগুলি ছোট এবং লেখকের হাতে সেগুলি সত্য-সত্যই গল্প হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্প বলবার কৌশল যেমন সুন্দর, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিটিও তেমনি মার্জিত ও হৃদয়গ্রাহী। ঘটনাসৃষ্টি, চরিত্র বিশ্লেষণ, পরিবেশের সহিত ঘটনা এবং চরিত্রের সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা গল্পকে প্রাণবন্ত করে তোলা—এ সমস্তই শিল্পীজনোচিত নিঃশব্দ নৈপুণ্যে তিনি সুন্দরভাবে সম্পাদন করে গেছেন। এই গল্পগুলির অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে। ছোট গল্পে lyrical element যে এমন মর্মস্পর্শী করে তোলা যায় লেখক তা' সুনৈপুণ্যে দেখিয়ে দিয়েছেন। এ গল্পের ধরণ অনেকটা শেখভের মত, আগাগোড়া আখ্যান ভাগকে নিখুঁত করে বললে, অথবা যে বেদনা অনুভূতি সাপেক্ষ তাকে বাক্-বিভূতিতে বিভূষিত করে তুললে ঊনবিংশ শতাব্দিতে অনেক হাততালি পাওয়া যেত—স্বয়ং মোঁপাসাও সেই সুলভ

হাততালির মোহ অনেক সময় কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেননি—কিন্তু শেখভই প্রথম অনুভব করেছিলেন যে ছোট গল্পে প্রকাশ-সংযমের প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে সে সংযম আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ছোট গল্প ছোট কবিতার মতো কোনো একটা বিশেষ ভাব বা অবস্থাকে কেন্দ্র করে ফুটে ওঠে, এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি নরনারীর জীবনের একটি দু'টি খণ্ড ছবি বিদ্যুৎ চমকের মত দেখা দিয়ে যায়। আশেপাশে পিছনে বহুকথা অকথিত থেকে যায়, রসিক পাঠক নিজের কল্পনা দিয়ে সে কথাগুলি পূর্ণ করে নেন। অনুভূতির দিক থেকে পাঠকচিত্তে সেইটিই আনন্দরসের সঞ্চার করে। "সপ্তপর্ণ" বইখানিতে আগাগোড়া সেই আনন্দ-রসের সঞ্চার ও তার ঘনিভূত মাধুর্য দেখতে পাওয়া যায়।

যে ছোট ছোট সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা প্রতিনিয়ত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী জীবনকে ঘিরে আছে—বাহির থেকে দেখলে যা বর্ণহীন নিষ্প্রাণ বা বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হয়—কিরণশঙ্করের "সপ্তপর্ণ"এর গল্পগুলিতে সেগুলি সুন্দর ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই ধরণের লেখাগুলির মধ্যে লেখকের তীক্ষ্ণ অথচ নির্দোষ ব্যঙ্গ করবার অপূর্ব কৌশলটি প্রচ্ছন্ন থাকায় এগুলি আরো রসাত্মক ও উপভোগ্য হয়েছে। আমাদের দেশে গল্প উপন্যাসে নির্দোষ ব্যঙ্গোক্তি প্রায় নাই বল্‌লেই হয়—কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার ধারায় এটা দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর লেখার ব্যঙ্গোক্তি প্রায়ই অতি স্পষ্ট। কিন্তু আপাতঃ ভাবে যে গল্প রসরচনার উপাদানে তৈরি নয়—তার মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে যে ব্যঙ্গরসের সুষ্ঠু পরিবেশন আমরা কিরণশঙ্করের লেখায় দেখতে পাই সেটা ব্যঞ্জনাত্মক…একেবারে সরাসরি নয় বলে

এবং অধ্যবসায় নাই বলে—তাঁর লেখার মধ্যে ব্যঙ্গরস বা "হিউমার" রঙ্গ-রসে পরিণত হয় নি—কাজেই সে রস-উপভোগ ভদ্র মনের একান্ত অনুকূল। বীরবল এই ধরণের গল্প কিছু কিছু লিখেছেন। আধুনিক কালের গল্প লেখকদের মধ্যে রঙ্গরস বা 'হিউমারে'র দিকটা তেমন খোলেনি।

'প্লট' বাদ দিয়ে রূপক বা সিম্বলের (Symbol) আশ্রয় নিয়ে যে সুন্দর রচনা জমানো যেতে পারে এবং তার ব্যঞ্জনাও যে গল্পের ব্যঞ্জনার সমগোত্রীয় হওয়া অসম্ভব নয়—"সপ্তপর্ণ"এর গল্পগুলিতে সেই কথাই প্রমাণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর অনেক কথিকা লিখেছেন—'লিপিকা' ও 'শেষ সপ্তক' এ।

কিন্তু এই বইখানির "কাহিনী" গল্পটিকে ঠিক সেই ভাবে বিচার করা চলে না—এটা Sui generis—a class by itself. এর জাতই আলাদা—এ গল্পটি পড়তে বসলে যেন গল্পে পেয়ে বসে—ছাড়বার উপায় থাকে না। এই গল্পটির বিশেষত্ব শুধু এর বর্ণনা-নৈপুণ্যে ঘটনা-সমাবেশে বা চরিত্র-চিত্রণে সীমাবদ্ধ নয়। এর অন্তর্নিহিত একটা বলিষ্ঠ পৌরুষ ও আভিজাত্যদৃপ্ত আত্মমর্যাদাবোধ, যা' একদা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দির বারো ভূঁইয়াদের ইতিহাসে দেখা যায়—তাই একটা জনশ্রুতিকে আশ্রয় করে এমন সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। সেই পৌরুষদৃপ্ত বলিষ্ঠ বাঙালীর কথাই "কাহিনী"কে এমন জীবন্ত করে তুলেছে। মাঝে মাঝে আমাদের মন সেই পৌরুস-কঠিন অতীতের দিকে সকৃতজ্ঞ ভাবে ফিরে চায়—কিন্তু "কাহিনী" কাহিনীই। তার appeal ছাড়া আমরা হাতের কাছে আর কিছুই পাই না। গল্পটি পড়তে পড়তে কেমন একটা মোহ আসে ; "ক্ষুধিত

পাষাণ”এর টেকনিকে লেখা এই গল্পটির জুড়ি বাংলা সাহিত্যে আর নাই বললেই হয়। এই গল্পে লেখকের অদ্‌ভুত লিপি-চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়—একটি দুটি হালকা কথার আঁচড়ে তিনি এক একটা চরিত্রের ভিতরটা সুদ্ধ উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়েছেন এবং সমগ্র ঘটনাকে তার স্বাভাবিক পরিবেশের সঙ্গে এমন নিপুণতায় সঙ্গে খাপ খাইয়েছেন যে “কাহিনী” একেবারে উচ্চশ্রেণীর গল্প ও কাব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতি সূক্ষ্ম রসবোধই কিরণশঙ্করের রচনার বিশেষত্ব এবং সেই জন্যই তিনি তাঁর লেখায় স্বকীয়তার দাবী করতে পারেন। এর প্রত্যেক গল্পটিই যেন এক একটি টল্‌টলে মুক্তা।

“সপ্তপর্ণ”এর দ্বিতীয় সংস্করণকে অভিনন্দন জানাই—আর সেই সঙ্গে স্মরণ করি দীর্ঘ দিনের অকৃত্রিম বন্ধু সুসাহিত্যিক কিরণ-শঙ্করকে। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও হৃদয়ের মাধুর্য মৃত্যুর ব্যবধানকে অতিক্রম করে প্রতিনিয়ত আমাদের শোকে সান্ত্বনা দিক—দুঃখে অবসাদে শক্তি সঞ্চার করুক।

স্বপ্ন-সায়র
১৬, বিপিন পাল রোড,
কলিকাতা-২৬

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশনার বিজ্ঞপ্তি

এই বইয়ের গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে লেখা। একমাত্র 'কাহিনী' ছাড়া বাকী সকল গল্পই সবুজপত্র, প্রবাসী, অভ্যুদয় প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'কাহিনী' অল্প কিছুদিন পূর্ব্বের লেখা। শেষ দুইটী কথিকা Richard Middleton এর রচনা অবলম্বনে লিখিত।

গল্পসূচী

শুকতারা

অবিনাশদের বাড়ীতে প্রতি রবিবার আমাদের যে আড্ডা বসত —তাকে সভা বললে অত্যুক্তি করা হয়—তাকে ক্লাব বললেও তার প্রতি অবিচার করা হয়, আসলে সেটা ছিল একটা পুরোপুরি আড্ডা। অবিনাশ জমীদারের ছেলে। ছেলেবেলায় তার বাপ মারা যাওয়াতে সে-ই ছিল বাড়ীর কর্ত্তা এবং বাড়ীর লোকের মধ্যে আর ছিলেন তার মা। অতএব তার বসবার ঘরে অথবা কখনো তাদের দোতলার খোলা ছাদে আমাদের যে সভা বসত তার তর্কে বা গানে বাধা দেবার কোন লোক ছিল না। আমরা সকলেই তখন কেউ পড়ছি, কেউ-বা সদ্য পাশ করে বেরিয়েছি। সংসারের সঙ্গে তখনও আমাদের ভাল ক'রে পরিচয় হয়নি। সভায় আমরা যে সকল বিষয় সাধারণত আলোচনা করতাম সে সকল বিষয় ছিল নিতান্ত অসার, যথা প্রোফেসারের পড়াবার রীতি, কলেজ স্কোয়ারের বক্তাদের মধ্যে কার বক্তৃতা ভাল, ফুটবলের শিল্ড্ পাবার সম্ভাবনাই বা কার, ইত্যাদি। তাই ব'লে গভীর বিষয় আলোচনা যে হ'তই না এমন নয়,—কিছুদিন পূর্ব্বে সুরেশের সঙ্গে মদনদার পাটের উপর ট্যাক্স্ বসান উচিত কিনা এই নিয়ে যে তর্ক হয়েছিল তার ফলে মদনদা দিন কয়েকের জন্যে আমাদের সভায় আসাই বন্ধ করেছিলেন। মদনদা আমাদের মধ্যে বয়সে সব চেয়ে বড় ছিলেন। মানুষের মুখকে যে অরসিকেরা 'বদন' আখ্যা দিয়েছিল তাদের প্রতি মনে মনে আমার একটা রাগ ছিল; কিন্তু মদনদাকে দেখলে একথা স্বীকার

করতে বাধ্য হতাম যে তাঁর মুখটা ছিল শুধু বদন নয়, একেবারে বদনমণ্ডল। সাদাসিদে, মোটা, গভীর, প্রশান্ত লোকটি, জুল্‌পির উপর চশমার নিকেলের ডাঁট দুটো একেবারে ব'সে যেত। এলোমেলো খামখেয়ালীভাবে খানিকটা গালে, বেশীর ভাগ চিবুকের নীচে দাড়ি উঠেছিল, মদনদা কেটে ছেঁটে সেগুলোকে সমানও করতেন না, বা কামাতেনও না। লোকে সচরাচর যাকে ধার্ম্মিক বলে, তিনি ছিলেন তাই—অর্থাৎ ভক্তির বিহ্বলতা বা অনন্তের প্রতি একটা ব্যথায় ভরা সূক্ষ্ম আকর্ষণ এ-সব কখনও তিনি অনুভব করেননি, কিন্তু গীতা, রাজযোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতি বই তিনি পড়েছিলেন এবং চুরুট খাওয়া, থিয়েটার দেখা, নাটক নভেল পড়া, কি স্ত্রী-স্বাধীনতার তিনি বিশেষ বিরুদ্ধে ছিলেন। পাঁচ বছর হ'ল তাঁর বিয়ে হয়েছিল। শুনেছি এরি মধ্যে তাঁর চারটি ছেলেপিলে হয়েছে। বলা বাহুল্য সচ্চরিত্র ব'লে মদনদার বিশেষ খ্যাতি ছিল। অর্থনীতিতে তিনি বিশেষ সম্মানের সঙ্গে এম-এ পাশ করেছিলেন এবং দেখেছি এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলে শেষ পর্য্যন্ত একটা গোলযোগ না হয়ে যেত না। আমরাও তাঁকে ও বিষয়ে ঘাঁটাতাম না। কিন্তু সুরেশের তো কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না,—তার পাঠ্য বিষয় ছিল physics, সে বিষয়ে তাকে কোন দিন কথা বলতে শুনিনি, কিন্তু রুশ-সাহিত্য বল, ইণ্ডিয়ান আর্ট বল, গ্রীক্ দর্শন বল, চীনদেশের ভাষাতত্ত্ব বল, যে কোন বিষয়ে কথা উঠলেই সুরেশকে তর্কে

পরাস্ত করা সোজা ছিল না। পূর্ব্বেই বলেছি আমাদের সভার হালচাল ছিল অত্যন্ত ঢিলেঢালা রকমের। কিন্তু যেদিন থেকে মদনদা আমাদের আসরে অবতীর্ণ হলেন সেদিন থেকেই সভার আইন-কানুন ঠিক হ'ল, রিপোর্ট লেখা হ'ল। মদনদার উপদেশ অনুসারে ঠিক হ'ল এক একদিন এক-একজন সভ্য একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখবেন এবং তারপর আলোচনা হবে। সভার একটা নাম দেওয়া হ'ল—আত্মোন্নতিবিধায়িনী সভা বা ঐ রকম একটা কিছু। কোথায় গেল আমাদের হাসি, উড়ো তর্ক, গান, বাজে গল্প ; এবার একেবারে রীতিমত সভা। আমাদের দলে যারা কবি বৈজ্ঞানিক বা সমালোচক ছিল তাদের কথা জানিনা, কারণ তারাই ছিল পাঠক ; কিন্তু আমরা ছিলাম শ্রোতা—তাই আমাদের অবস্থা ক্রমশঃ অত্যন্ত করুণ হয়ে উঠেছিল। কিছু পরিমাণ আড্ডার লোভে, কিছু পরিমাণ কাটলেট চা'র লোভে এসে আমরা একেবারে উন্নতির জাঁতাকলে প'ড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভগবান যাকে রক্ষা করেন তাকে মারা মদনদার কর্ম্ম নয়, সেই কথাই প্রমাণ হ'ল। হঠাৎ এক বর্ষা সন্ধ্যায় আমাদের সমস্ত ভাল সঙ্কল্প উড়ে গিয়ে আবার আমরা নিতান্ত অসার আলোচনা নিয়ে দিন কাটাতে লাগলাম এবং মদনদাও আমাদের ত্যাগ করলেন। কি করে আমাদের এই অধঃপতন হ'ল তাই নিয়েই এই গল্প।

তিনটে প্রবন্ধ পড়া হয়েছিল। প্রথম প্রবন্ধ পড়ল অবিনাশ—

বিষয় "আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত বাংলা সাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনা"। দ্বিতীয় প্রবন্ধ পড়ল আমাদের ঐতিহাসিক শ্রীপতি—বিষয় ছিল "চন্দ্রগুপ্তের নাম চন্দ্রগুপ্ত ছিল কিনা"? তন্ত্র, পুরাণ, বেদ, উপনিষদ, এমন কি সন্ধির নিয়মগুলি মন্থন ক'রে শ্রীপতি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে চন্দ্রগুপ্তের নাম চন্দ্রগুপ্তই ছিল। তৃতীয় প্রবন্ধ পড়ল সুরেশ—বিষয় ছিল—"Economo-Biological Background of Euro-American Civilization"। তার পর পালা ছিল মদনদার, কথা ছিল তিনি Bimetallism সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়বেন কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। সেদিনটা ছিল আষাঢ়ের একটা বর্ষণমুখর দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টির পর যদিও সন্ধ্যার পূর্ব্বে বৃষ্টি ধরেছিল, তবু আসন্ন বৃষ্টির ভাবটা আকাশ থেকে যায়নি। মদনদার আসতে দেরী হচ্ছিল কিন্তু সে জন্যে আমরা বিশেষ দুঃখিত ছিলাম না।

একবার সেই বর্ষা-সন্ধ্যাটার কথা ভেবে দেখো—মেঘভরা আকাশের পশ্চিম প্রান্তে দিগন্তের গাছ এবং ছাদগুলোর ঠিক মাথার উপরে মেঘের ফাটল দিয়ে ঝ'রে-পড়া সূর্য্যাস্তের রঙীন আভা তখনও একেবারে মিলিয়ে যায়নি। আমরা ছাদে কেউবা চেয়ারে কেউবা চাতালের উপর খবরের কাগজ পেতে ব'সে ছিলাম। ছাদের পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছের বৃষ্টি-ধোয়া পাতাগুলো ঝল্‌মল্ করছিল। পাতার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে রাস্তার চলন্ত

ট্রামের আলো দেখা যাচ্ছিল। ছাদের টবে অনেকগুলো বেলফুল ফুটেছিল, দক্ষিণের মাতাল বাতাস হঠাৎ এসে এসে তার মাঝখানে লুটিয়ে পড়ছিল। সত্যি বলছি সেদিন অর্থনীতি শোনবার মত মনের অবস্থা আমাদের ছিলনা। কি সব কথা যে এলোমেলো ভাবে মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল বোঝাতে পারব না। সেদিনকার হাওয়ার মত আমাদের কথাবার্ত্তাও হঠাৎ এসে অমনি এলিয়ে পড়ছিল। সত্যেন গুন গুন ক'রে গান ধরেছিল "এমনি দিনে তারে বলা যায়।" সত্যেন গানের সব কথাগুলো জানত না, কিন্তু আমরা তাকে থামতে দিলাম না। সে ফিরে ফিরে দু-চার কলি গাইতে লাগল। কথার অসম্পূর্ণতা অথবা সুরের যেটুকু মিষ্টতার অভাব ছিল, আমাদের মনের উত্তেজনা সেটুকু পূরণ ক'রে নিচ্ছিল। তখনও জীবনে কোন বিশেষ নারীর আবির্ভাব হয়নি বটে, তবু যে যেটুকু জেনেছিলাম—চলন্ত স্কুলের গাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়ে নিমেষের দেখা একজোড়া চোখ—অথবা এমনি কিছু—তারই অস্পষ্ট স্মৃতির চারিদিকে আমাদের মন ঘুরে ঘুরে গুন গুন করে সেই কথাই বলতে যাচ্ছিল—যার ইঙ্গিত ছিল গানে, ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে ঝ'রে-পড়া সূর্যাস্তের স্বর্ণ-আভায়, দখিন হাওয়ার গন্ধ-বিভোর মত্ততায়। যাদের সঙ্গে মিলন হয়নি—সাক্ষাতও হয়নি—তাদের বিরহে ব্যথিত হয়ে উঠেছিলাম।

সপ্তপর্ণ

অমল আমাদের দলের মেম্বার ছিল বটে, কিন্তু অনেকদিন তার সাথে আমাদের দেখাশুনা ছিলনা, কারণ প্রায় এক বছর হ'ল সে তাদের গ্রামে গিয়ে বাস করছিল। সম্প্রতি সেখান থেকে ফিরেছে। একটা ইজিচেয়ারে অর্দ্ধেক শোওয়া অবস্থায় সে বসেছিল। বলছিল—আমাদের এই মাটির পৃথিবীর সঙ্গে আকাশের যে কী প্রেমলীলা চলে সে আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। গ্রীষ্মের দুপুরে দেখেছি আকাশের নিবিড় আলিঙ্গনে মূর্চ্ছিতা ধরণী। ঝড়ের দিনে দেখেছি উন্মাদ কালো আকাশ অন্ধরোষে পৃথিবীর উপর কি অত্যাচারই না করে—যেন ঈর্ষায় পাগল, সবুজ অঞ্চলের নীচে পৃথিবীর বুকটা দুলে দুলে ফুলে ফুলে ওঠে—তার পর চোখের জলে পৃথিবীর বুক ভাসিয়ে তবে তার সে রাগ শান্ত হয়। আবার দেখেছি শরতের ভোরের বেলায় আকাশ কি মধুর করুণ ব্যাকুল সুরে যে আহ্বান করে—সমস্ত গৃহকর্ম্মের মাঝখানে থেকে পৃথিবীর মনটা যেন উদাস হয়ে যায়; তার বুকটা অকারণে দীর্ঘশ্বাসে ভ'রে ওঠে—কখনও মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে, কখনও বা চোখ জলে ভ'রে আসে বর্ষার গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখেছি মেঘাচ্ছন্ন স্তব্ধ আকাশ পৃথিবীর মুখের উপর অনবরত, ম্লান পৃথিবী মৌন—একটা বৌ-কথা-কও পাখী উড়ে উড়ে কেবলি বলছে—কথা কও, কথা কও—তার পর অকস্মাৎ আকাশ থেকে ঝর ঝর চোখের জল—সে চোখের জলের যেন আর শেষ ছিলনা। এই রকম কত রূপে কত বর্ণে কত ভাবে

শুকতারা

মায়াবী আকাশ যে পৃথিবীকে তার প্রেম জানাত সে তোমাদের কি বলব। ভোরের বেলায় দেখেছি তার চাঁপা রঙের উত্তরীয়, সূর্য্যাস্তে দেখেছি তা'র স্বর্ণভূষা, সন্ধ্যায় দেখেছি তার চাঁদের কিরীট, তারার মালা। পৃথিবীকেও দেখেছি—বৈশাখে সে ধূলি-শয্যায় নিরাভরণা মানিনী, বর্ষায় সে পত্রপুষ্প-সজ্জিতা অভিসারিকা। আমাদের এই পৃথিবী কখন কোন আদিমকালে কে তাকে ঘরছাড়া করেছে সেই থেকে রাত্রিদিন কা'র উদ্দেশে চলেছে, সে নিজেই জানেনা। আর আকাশ তার চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা নিয়ে, আলো-অন্ধকার নিয়ে পৃথিবীকে বলছে প্রিয়া, প্রিয়া, সে যে আমি, সে যে আমি। এমনি ক'রে অমল কখনো থেমে, কখনো চুরুট্‌টা মুখ থেকে হাতে বা হাত থেকে মুখে নিয়ে আপন মনে ব'লে যাচ্ছিল। আমরা কখনও শুনছিলাম, কখনও বা তার কথায় আমাদের মনে বহুদিনকার ভুলে যাওয়া দু-একটা ঘটনার স্মৃতি ভেসে আসছিল। তার পর কোন প্রসঙ্গে আকাশ পৃথিবী বর্ষা শরৎ ছেড়ে অমল কি সূত্রে যে নিজের কথা তুলল তা আমাদের মনে নেই। তবে যেই সে নিজের কথা আরম্ভ করল অমনি আমরা সজাগ হয়ে বসলাম।

অমল বলল—দেখ, আমি যখন প্রথম প্রেমে পড়ি তখন আমার বয়স তের কি চৌদ্দ—না—তারও আগে স্ত্রীবেশধারী একটি যাত্রাদলের ছোকরাকে বিয়ে করবার ইচ্ছা হয়েছিল, তবে সেটা বিশেষ গুরুতর হয়নি। তের বছর বয়সে

প্রেমের কথা শুনে বুঝতে পারবে একটু অল্প বয়সেই পেকেছিলাম—

সুরেশ বলল—ওহে গল্পটা সত্যি তো ?

অমল বলল—আগে শোনো, তার পর প্রশ্ন কোরো—

মদন-দা এসে পড়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ শোনার কারও কোনরূপ আগ্রহ না দেখে গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন। তিনি বললেন—দেখুন অমলবাবু, আমি যতদূর বুঝি, বিয়ের পূর্ব্বে অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি যে অনুরাগ হয়—

সুরেশ বলল—মদন-দা Freud ও সম্বন্ধে কি বলেছে সে তো—

মদন-দা বললেন—সুরেশ, আমার কথাটা আগে শেষ করতে দাও, আমি বলি ও বিলেতে হয়ে থাকে, আমাদের দেশে—

সুরেশ আবার একটা কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু আমরা বাধা দিলাম। বললাম, আঃ সুরেশ, আজ আর তর্ক করো' না—মদন-দা, আজ আমাদের ক্ষমা করুন।

আবার আমরা চুপ করে বসলাম—আমাদের চারিদিকে রাত্রির নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। মদন-দা'ও গম্ভীর হয়ে ব'সে রইলেন। অমল আবার বলতে লাগল—এবার আর গল্পে বাধা পড়ল না। আস্তে আস্তে, থেমে থেমে সে বলছিল—মনে হ'ল যেন সেই মেঘান্ধকার সজল সন্ধ্যার ম্লান আলোতে বহুদিন

আগেকার ঝ'রে পড়া গোলাপের পাঁপড়িগুলো কুড়োবার জন্যে সে তার অতীত জীবনটা হাতড়ে খুঁজছিল।

অমল বলল—আশা করি মদনদা ও ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু সত্যি বলছি ভালবাসায় আমি অনেকবার পড়েছি। সে ভালবাসা দু-দিন ব্যাপীও হয়েছে, দু-বছর ব্যাপীও হয়েছে। সেগুলো প্রেম কিনা, আজ তা নিয়ে তর্ক ক'রে কোন লাভ নেই। কোথায় যেন পড়েছি যে মানুষ ফিরে ফিরে প্রথম প্রেমের কথাই মনে আনে। আজ অনেকদিন পরে আমারও সেই প্রথম বারের কথা মনে পড়ল। সেই কথা আজ তোমাদের বলব। তবে কতটা সত্যি ঘটেছিল কতটা বা আমার কল্পনা তা এতদিন পরে আমার পক্ষে বলা অসম্ভব। তখন পড়তাম গ্রামের ইস্কুলে থার্ড ক্লাসে কি সেকেণ্ড ক্লাসে ; কিন্তু ক্লাসের পাঠ্যের চেয়ে অ-পাঠ্যের দিকে আমার মন ছিল বেশী। ঐ বয়সেই বঙ্কিম, রবিবাবু এমন কি "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম"ও পড়েছিলাম। সব যে বুঝতে পারতাম তা নয়, তবু এটা বুঝতে পারতাম যে চাণক্য শ্লোকে গভীর তত্ত্ব যতই থাকনা কেন, রস কণামাত্র ছিলনা। তবে সাহিত্যের অন্য রসের চেয়ে বীর রসের প্রতিই আমার ঝোঁক ছিল বেশী। জগৎসিংহ, হেমচন্দ্র, মোহনলালের আদর্শে জীবনটাকে গড়ে তুলব এই ছিল তখন ইচ্ছা—অবশ্য যুদ্ধশেষে বিজয় লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের ঝাড় এবং ইংরাজী বাদ্য সহকারে আরও কোন লক্ষ্মীর সাথে মিলনের লোভ আমার না ছিল তা নয়।

· সে সময়টা ছিল শীতকাল। তোমরা কখনও কলকাতা ছেড়ে বড় একটা বেরোওনি ব'লে বাংলা দেশের কোন ঋতুর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় নেই ; সেই জন্যে বসন্তকাল সম্বন্ধে তোমরা কবিয়ানা ক'রে থাক। সত্যি যদি বাংলা দেশ দেখতে চাও তবে শীতকালে পাড়াগাঁয়ে যেও। সে সময় বাংলার পল্লী যে কি আশ্চর্য্য শ্রী ধারণ করে তা না দেখলে বোঝান যায় না। আকাশ থাকে নীল—গ্রীষ্মের আকাশ যেমন কঠিন পাথরের মত নীল তেমন নয়—কোমল নীল, তারি মাঝে মাঝে স্বচ্ছ শাদা মেঘের সূক্ষ্ম রেখা টানা। কলকতার আকাশকে দূরে রেখেছে কলের চিমনী আর গীর্জ্জার চূড়ার খোঁচা দিয়ে ; কিন্তু গ্রামে আকাশের সঙ্গে বাঁশ ঝাড়ের নারিকেল গাছের মাখামাখি চলেছে অবিশ্রাম। আকাশ নেমে এসে ক্ষেতের উপর, দূর গ্রামের গাছগুলোর উপর একেবারে লুটিয়ে পড়েছে। শীতের ভোরের বেলা কুয়াশা কাটিয়ে যে রোদটুকু ওঠে চাঁপার মত তার রঙ।

এমনি একটা শীতের সকাল বেলায় পড়ায় ভঙ্গ দিয়ে আমাদের অন্দরের বাগানের কুলগাছের উপর উঠেছিলাম। তখন আমাদের ক্লাসের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। ফল তখনও বের হয়নি। কিন্তু দাদার শাসনে পড়া কামাই করবার যো ছিল না। নতুন পড়া না থাক পুরোনো পড়াতো ছিল, আর পুরোনো পড়ার এক মজা দেখেছি যে তার আর শেষ নাই—যতবার খুসী ফিরে ফিরে পড়া যায়। সেই পুরোনো পড়ায় ভঙ্গ দিয়ে কুল-

গাছে উঠেছিলাম, তাই বিশেষ সাবধান হবার প্রয়োজন ছিল পাছে দাদা টের পায় যে পড়ার ঘরে আমি নেই। কিন্তু ছোড়দি ছিল। সে আমার জ্যা'ঠতুত বোন—আমার চেয়ে বছর খানেকের বড়। আমরা যে মাষ্টারের কাছে পড়তাম সেও তাঁর কাছে পড়ত—কিন্তু সে পড়া নিতান্ত তার খেয়াল মত চলত। রবিবার সকালেও সাড়ে নটার আগে আমাদের ছুটি ছিলনা, কিন্তু ছোড়দির পক্ষে সোমবারে রবিবারে কখনও কোন প্রভেদ দেখিনি। সে যখন খুসী আসত, যখন খুসী বেণী দুলিয়ে ভিতরে চলে যেত। তারপর মাস ছয়েক হ'ল বোধোদয়, সাহিত্য পাঠ এবং সেকেণ্ড্ বুক্ প্রভৃতি গ্রন্থ শেষ ক'রে তার শিক্ষা সমাপ্ত হ'ল। তারপর সে অন্দরে ঢুকল, আর বড় একটা বাইরে আসত না। তখন থেকে আমাদের উপর সে ভারি মুরুব্বিয়ানা করত। তার জ্বালায় পড়া কামাই ক'রে বাগানে ঘোরা কি বাড়ির ভিতর থাকা একেবারে অসম্ভব ছিল। ইস্কুল থেকে ফিরে বাড়ীর ভিতর ঢোকামাত্র ছোড়দি প্রশ্ন করত—কি? আজ ক্লাসে কত ছিলে? লাষ্ট্ নাকি? আমরা কোন দিন এমন কোন কাজ করতে পারিনি যা ছোড়দির চোখ এড়িয়েছে বা যে সম্বন্ধে সে কিছুমাত্র বাক্‌সংযম দেখিয়েছে। সেদিনও কুলগাছে পাঁচমিনিট থাকতে না থাকতেই তার গলা শুনতে পেলাম—সকাল বেলা কুলগাছে কেরে? প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে উত্তর না পেয়েও শান্ত সন্তুষ্ট থাকবে, ছোড়দির প্রকৃতি সে রকম ছিলনা। কোন প্রশ্ন

'মনে উদয় হওয়ামাত্র তার মীমাংসা না করতে পারলে তার মানসিক যন্ত্রণা হ'ত। অতএব গাছতলায় তার আগমন আশঙ্কা ক'রে গাছের উপর আত্মগোপন করবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু ধরা পড়লাম। ছোড়দি বললে—কে—অম্‌লা বুঝি? অত্যন্ত ছেলেবেলায় সবাই যখন আমার নামটাকে বিকৃত করতেন তখন তাতে আপত্তি করবার বয়স আমার ছিল না। কিন্তু তের চৌদ্দ বছর বয়সে ও নাম শুনলে আমার ভারি রাগ হ'ত। বাড়ীতে সকলে যখন আমায় অমল ব'লে ডাকতেন, ছোড়দি তখনও 'অম্‌লা' বলা ছাড়ল না। কিন্তু আমার নামমাধুর্য্য অথবা আমার বয়সের মর্য্যাদা এর কোনটাই ছোড়দি রক্ষা করবে এ আশা করা বৃথা। যা হোক আমি তার অনাবশ্যক প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বেছে বেছে কুল খাচ্ছিলাম। ছোড়দি বললে—দাদাকে ব'লে দেবো যে সকাল বেলা পড়াশুনো ছেড়ে ওঠা হয়েছে। মুখে বললাম, দাওগে না। কিন্তু মনটা দমে গেল। দেখলাম ছোড়দির অভিপ্রায় ঠিক তত খারাপ নয়—কুল চায়। তারপর আমি কুল দিচ্ছি-সে কুড়োচ্ছে।

এমন সময় বাগানের বেড়ার ওধার থেকে মেয়েলী গলায় ডাক শোনা গেল—টুলি—! টুলি আমার ছোড়দির নাম। ছোড়দি বাগানের দরজার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে ডাকল—আয় না। আমি তাদের দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু বুঝলাম যে আমি থাকতে মেয়েটি আসতে দ্বিধা করছে। ছোড়দি বলল—আরে

ও আমাদের অম্‌লা। সে এল। অপরিচিতা মেয়েদের সামনে আমার ভারি লজ্জা করত তাই তার মুখের দিকে তাকান আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। ছোড়দি আমায় বললে—ভাল দেখে পাড়্। প্রথমটা সে লজ্জায় দাঁড়িয়ে রইল, তারপর একটু একটু ক'রে তার লজ্জা কেটে গেল। আমি কুল পাড়তে লাগলাম, তারা পরস্পরকে ঠেলাঠেলি ক'রে হাসাহাসি ক'রে কুড়োতে লাগল। নিজের জন্যে বেছে বেছে যে সব ভাল কুল পকেটে জমা করেছিলাম, তাও পকেট শূন্য ক'রে তাদের দিয়ে দিলাম। তারপর সে চলে গেল—বাগানটা হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। দিদিকে জিজ্ঞাসা করলাম—ও কে? দিদি একটা কুলের অর্দ্ধেকটা কামড়ে নিয়ে বাকিটার উপর চোখ রেখে অত্যন্ত সংক্ষেপে জবাব দিলে—তোর বৌ!

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার ভিতর, বাহির বদলে গেল। মনে হ'ল সে যেন একান্ত আমার আপনার। আমি দেখতে পেলাম সে ব'সে আছে বাসর ঘরের পাটির উপর লজ্জাবনত হয়ে আমার আগমনের প্রতীক্ষায়। সারাদিনের উপবাসে তার মুখটি শুকিয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি আলো জ্বালিয়ে, বাজনা বাজিয়ে আমার মাথায় মুকুট, গলায় ফুলের মালা। যুগে যুগে আমি তাকে পেয়েছি কখনও কালো ঘোড়ার উপর চ'ড়ে, মন্ত্রপূত বাঁকা তলোয়ার হাতে ক'রে দৈত্যপুরী থেকে তাকে উদ্ধার ক'রে। আসন্ন সন্ধ্যায় তেপান্তরের মাঠ ধূ-ধূ করছে—সে যেন আর ফুরোয়

না—সমস্ত দীর্ঘ পথটা তার দুই ক্ষীণ বাহু দিয়ে আমাকে সে জড়িয়ে ধরেছে। কখনও বা তাকে পেয়েছি স্বয়ম্বর সভায় লক্ষ্য বেধ ক'রে, সমস্ত রাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে। কখনও বা ঝোড়ো রাতে ভগ্ন মন্দিরে স্তিমিত আলোকে তার সঙ্গে আমার দেখা। যে সকল কাব্য উপন্যাস পড়েছিলাম সে সব যেন তারি সঙ্গে আমার মিলন হবার অপূর্ব্ব কাহিনী। আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম নিজের দিকে তাকিয়ে—যে আনন্দ লোকে চির বসন্তের দেশে প্রতাপ, জগৎসিংহ বাস করে, আমি যেন সেই দেশের অধিবাসী—প্রতাপ, হেমচন্দ্রের সহচর—এই আমি! কত তুচ্ছ মনে হ'ল দাদার শাসন আর পুরোনো পড়ার অত্যাচার। কিন্তু আনন্দের মধ্যে কোথায় যেন ব্যথা দিয়ে লুকিয়ে ছিল। সেই ব্যথার স্পর্শে যে আকাশ যে গাছ যে ফুলের দিকে কখনও তাকাই নি—তা অকস্মাৎ মধুর হয়ে উঠল। চেয়ে দেখলাম—অন্দরের পুকুরের পাড়ে গাঁদাগুলো ফুটে ফুটে আপনাকে একেবারে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। উত্তরে বাতাসে পুকুরের জলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে এবং ভোরবেলাকার রোদ তার উপর ঝিক্ মিক্ করছে। বাগানে আল্ বেঁধে বেঁধে কপির চারা লাগান ছিল—বুড়ো মালী ঝাঁঝরায় ক'রে তাতে জল দিচ্ছিল। সেই জলের ধারা ভোরবেলাকার রোদের সেই ঝিকিমিকি, শিশির ভেজা সেই ঘাস, সেই গাঁদা ফুল, এমন কি সেই বুড়ো মালীর জল আনা, জল ঢালা—সব শুদ্ধ পৃথিবীটা যে এত সুন্দর তা

ইতিপূর্ব্বে কখনও চোখে পড়েনি। যা দেখি অমনি মনে হয়- কি আশ্চর্য্য—কি আশ্চর্য্য!

ছোড়দি অনেকক্ষণ চলে গেছে। ঘরে ফিরে এসে হঠাৎ আয়নায় চোখ পড়ল। জগৎসিংহের কথা মনে হ'ল—একবার নিজের চেহারা ও বেশভূষার দিকে তাকিয়ে নিলাম—দেখলাম জগৎসিংহের সঙ্গে মিলল না। কাপড়টা কোমরে বাঁধা—এজন্যে মার কাছে অনেকদিন বকুনি খেয়েছি—গায়ে ফ্লানেলের একটা শার্ট, সেও বেশী পরিষ্কার নয়—বোতামও অধিকাংশই নেই—তা হোক কিন্তু গর্ব্বে মনটা একেবারে ভরে গিয়েছিল। মনে হ'ল এমন বিস্ময়কর ঘটনা পৃথিবীতে কখনও ঘটেনি। মনে মনে স্থির করলাম তাকে আমি বিয়ে করবই। বোধ হ'ল আমার চেয়ে সে বছর খানেকের বড় হবে, কিন্তু তাতে আমার কিছু আপত্তি ছিলনা।

কামিনীদাদা গ্রাম সম্পর্কে আমার কি রকম যেন দাদা হতেন। খবর পেলাম মেয়েটি তাঁর শালী। কামিনীদাদার নবম না দশম সন্তানের অন্নপ্রাশনে তাঁর শালী ও শাশুড়ী এখানে এসেছিলেন। সে দিন থেকে কামিনীদাদার ছেলে রাখালের প্রতি আমার মনোভাব বদলে গেল। রাখালের মস্ত মাথা, পেট ভরা পিলে, বড় বড় গোল দুই চোখ, কিন্তু তার গলা

জড়িয়ে ধ'রে সত্যি একটা তৃপ্তি পেলাম। এর পূর্ব্বে রাখালের প্রতি আমার এত স্নেহ কেউ কখনও দেখেনি। এমন কি সকলেই জানত যে তার উপর আমাদের বিশেষ রাগ ছিল। তার কারণ যদিচ রাখুর বয়স মাত্র দশ বছর ছিল, দুষ্টু বুদ্ধিতে তার জুড়ি সে গ্রামে কেউ ছিল কিনা সন্দেহ। মিথ্যা কথা এবং চুরি বিদ্যায় সে ছিল ওস্তাদ। আমাদের মার্ব্বেল, লাটাই, ঘুড়ির সূতো তার জন্য রাখাই মুস্কিল হ'ত। তা ছাড়া গুরুজনের কাছে নালিশ করতে তার মত কেউ পারত না। রোজ অন্ততঃ বার দশেক ক'রে সে আমাদের নামে নালিশ করত। তার উপর সে এমনি কাঁদুনে ছিল যে তাকে কোন দিন একটা চড় মেরেছি কি সে এমনি জোরে এবং এমনি করুণ সুরে আর্ত্তনাদ করত যে লোকে মনে করত তাকে কেউ খুনই করেছে বা সেই রকম একটা কিছু। সেই রাখালকে অযাচিত হয়ে একটা লাটাই দিয়ে ফেলেছিলাম। তার প্রতি এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক স্নেহে কেবল যে দলের লোক বিস্মিত হ'ত তা নয়। রাখালের গোল চোখ আরো গোল হয়ে উঠত। বোধ করি তার মনে আমার মতলব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ হ'ত, তাই ব'লে দেওয়া জিনিষ নিতে সে গররাজি হবে—রাখালের মন এত অনুদার ছিল না। কিন্তু রাখালের কাছে যে খবর পেলাম সে অতি সামান্য। সে শুধু এই যে—তারা দিন দশেক থাকবে—আর জেনেছিলাম তার নাম। তার নাম—তোমাদের

তা শুনে লাভ নেই, কারণ তার মধ্যে তোমরা কোন মাধুর্য্যই দেখতে পাবে না—আর আমিও আজ তাতে হয়তো কোন বিশেষত্বই দেখব না। সে অতি গ্রাম্য ধরণের নাম—সরলা কি অবলা কি এই রকমের একটা কিছু। কিন্তু তবু এও সত্য যে একদিন ঐ নামটা আমার সমস্ত ভুবন সুরে সুরে রঙিয়ে দিয়েছিল।

বিকেল বেলা খেলায় মন লাগত না। যে পরমাশ্চর্য্য অনুভূতি পেয়েছিলাম তার কাছে খেলা-টেলা তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। মন আপন মনে কেবলি বলত—ভালবাসি—আমি ভালবাসি। এক একবার ইচ্ছা করত কথাটা প্রকাশ করি। কিন্তু প্রকাশ করলে তার ফল শুভ হবে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তাই করা হ'ল না। তবে একদিন খেলার শেষে নবীনদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মেয়েদের কোন নামটা তাদের ভাল লাগে। দেখলাম এ সম্বন্ধে তাদের কিছুমাত্র ঔৎসুক্য নেই; অবলা, সরলা, কি তরলা কারও প্রতি তাদের বিশেষ পক্ষপাত দেখলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম—কাকেও বিয়ে করতে ইচ্ছা করে কি না? কোন প্রকার চিন্তা বা দ্বিধা না করে নবীন বললে—তার দিদির ননদকে। সমস্ত পৃথিবীতে বিশেষ ক'রে কেন নবীন তার দিদির ননদকে নির্ব্বাচন করল তার কোন সন্তোষজনক কারণ সে দেখাতে পারল না, এমন কি প্রকাশ পেল তাকে সে দেখেও নি। তার দিদির ননদকে বিয়ে করতে

না পারলে নবীনের হৃদয়ও ভঙ্গ বা অনুরূপ কোন দুর্ঘটনা যে ঘটবে এরকম মনেই হ'ল না। যতুকে জিজ্ঞাসা করলাম, দেখলাম পাত্রী সম্বন্ধে তার মন অতি উদার—তবে তার দাদা বিয়ে ক'রে একটা সাইকেল পেয়েছিলেন—সেই রকম একটা সাইকেলের প্রতি তার বিশেষ লোভ ছিল এবং গড়ের বাদ্যের জন্যে তার যতটা উৎসাহ দেখা গেল কোন বিশেষ পাত্রী সম্বন্ধে ততটা উৎসাহ দেখা গেল না। বেশ বুঝলাম, আমি যে স্বপ্ন-লোকে ছিলাম নবীন সতীশ প্রভৃতি তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানেনা। শীতের একটা সকাল বেলায় তাদের ও আমাদের মধ্যে একটা মস্ত ব্যবধান হয়ে গেছে। তাদের নেহাৎ ছেলেমানুষ ব'লে মনে হ'ল।

সমস্ত খেলা ও গল্পের মধ্যে তাকে দেখবার ক্ষুধা ভিতরে-ভিতরে আমাকে পীড়া দিচ্ছিল। আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে, দাসেদের কঞ্চির বেড়া-ঘেরা বেগুন খেতের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা এঁকে বেঁকে গেছে সেই রাস্তায় খান দুয়েক বাড়ীর পরেই কামিনী দাদার বাড়ী। ইতিপূর্ব্বে কতদিন সে বাড়ীতে যে গেছি তার ঠিক নেই। কিন্তু সে বাড়ীতে যেতে আজ যেন বাধছিল। তবু রাখালের খোঁজে দু-একবার গেছি। যাওয়ামাত্র রাখালের দেখা পেয়েছি। কিন্তু তার মাসীর সাক্ষাৎ যেমন দুর্লভ ছিল তেমনি দুর্লভই রয়ে গেল। আর এক আশা ছিল সে যদি আমাদের বাড়ীতে আসে। বাড়ীর ভিতরের সঙ্গে

আমার বিশেষ সম্পর্ক ছিলনা এক খাবার সময় ছাড়া। আজ-কাল সেখানেও ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করলাম, কিন্তু সেখানে গেলেই ছোড়দি একেবারে তেড়ে আসত। বলত, যাও যাও বাইরে যাও—রাত দিন বাড়ীর ভিতরে কেন? পাছে প্রেমিকের আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগে এই ভয়ে তার সঙ্গে তর্ক করতাম না—চলে আসতে হ'ত। এমনি ক'রে তাকে দেখবার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি—এমন সময় একদিন বিকেলে জল-খাবার খেতে অন্দরে গেছি—সচরাচর লোকে যেমন ক'রে চলে তেমন ক'রে চলা আমার অভ্যাস ছিল না,—প্রথমত বা'র বাড়ী থেকে বাড়ীর ভিতরের পথটা এবং বাড়ীর ভিতরকার উঠানটা কতকটা লাফিয়ে কতকটা ছুটে চলতাম, তার পর সেই ঝোঁকে উঠান থেকে বারান্দায় একেবারে লাফিয়ে উঠতাম—সিঁড়ি ব্যবহার করতাম না। সেদিনও তেমনি করে সশব্দে ঝুপ ক'রে মার কাছে উপস্থিত হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছি। দেখি মার কাছে ব'সে একটি গিন্নি গোছের মোটা-সোটা স্ত্রীলোক—তাঁর একগাল পান এবং গোল মোটা হাতে লাল টক্‌টকে অনন্ত, কপালে মস্ত একটা সিন্দুরের টিপ। তাঁর পাশে সেই মেয়েটি আর ছোড়দি। নিজেকে কোন রকম সামলে নিয়ে বারান্দায় থামের আড়ালে দাঁড়ালাম। মা বললেন অমু প্রণাম কর্। প্রণামটা আমার ভাল আসত না। কোন রকমে সেই গিন্নীকে প্রণাম করলাম। মোটা গলায় প্রশ্ন হ'ল, তোমার নাম কি? আমি বললাম—

অমল। মা বললেন—ভাল ক'রে বল্। আমি বললাম—শ্রীঅমল চন্দ্র বসু। পুনরায় প্রশ্ন হ'ল—কোন্ ক্লাসে পড়? ছোড়দি ফস্ করে বলল—ও থার্ডক্লাসে পড়ে, এবার যদি পরীক্ষায় পাস করে তাহ'লে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠবে। গিন্নী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল—আমাদের নেপাও থার্ডক্লাসে পড়ে—না? মেয়েটি বললে—তুমি কি বল মা! সে আজ দু'বছর ফিপ্‌থ্‌ ক্লাস থেকে প্রমোশন পাচ্ছে না। গিন্নী বললেন—তা তার শরীর অসুখ, কি করবে? তবে তার পড়াশুনোয় মনোযোগ আছে। পড়াশুনা থেকে আমার এবং নেপার বয়সের কথা উঠল। নেপার জন্ম বৈশাখের প্রথমে না শেষে তা নিয়ে গোল বাধল, তারপর গিন্নীর মনে পড়ল যে বৈশাখের সেই যে বড় ঝড়টা হয়েছিল যাতে তাদের চণ্ডীমণ্ডপের চালটা উড়ে গিয়েছিল তারি দশদিন, না না—আট দিন পরে নেপার জন্ম হয় ঢেঁকিশালার পাশের ঘরটাতে ইত্যাদি। নেপালের জন্ম তারিখের গোলমালে সেখান থেকে চলে এলাম। যতক্ষণ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলাম মেয়েটি তার মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল ব'লে ভাল ক'রে জবাব দিতে পারছিলাম না; তা ছাড়া ও সকল প্রশ্নে ভিতরে ভিতরে অপমানিত বোধ করছিলাম। কিন্তু গ্লানি রইল না। সে আমার পক্ষ নিয়েছে। বুঝলাম সেও আমায় ভালবাসে। মনটা আনন্দে ভরে গেল। আমি নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারছিলাম না।

কি ক'রে কোন বিষয়ে পারদর্শিতা দেখিয়ে সমস্ত গ্রামের দৃষ্টি এবং বিশেষ ক'রে তার দৃষ্টি যে আমার দিকে আকৃষ্ট করব তাই নিয়ে কল্পনা করতাম। যদি সেকাল হ'ত তবে নবীন সতু প্রভৃতিকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে হারিয়ে তার মন জয় করতে পারতাম; একালেও যদি পরীক্ষায় প্রথম হ'তে পারতাম অথবা ম্যাচ খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারতাম তাহ'লে হয়ত সে টের পেত যে নিতান্ত সামান্য লোক নই। লোকের মুখে আমার খ্যাতি শুনে নিশ্চয় সে আমার জন্য গর্ব্ব অনুভব করত। কিন্তু আমি চিরকাল মাঝারি, পরীক্ষায় জীবনে কখনও প্রথম হই নাই। খেলাতেও এমন কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারিনি যাতে ক'রে আমার নাম লোকের মুখে মুখে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। মনে পড়ল কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের গ্রামে একজন ম্যাজিক-ওয়ালা এসেছিল। ম্যাজিক দেখবার দিন সন্ধ্যাবেলা গ্রামের সমস্ত লোক কি প্রশংসমান চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিল! তারপর সে যখন অসম্ভব জায়গা থেকে ডিম, ঘড়ি প্রভৃতি বের করতে লাগল তখন আমরা ভেবেছিলাম তার অসাধ্য কোন কাজ নেই। তারপর যে দু-একদিন সে লোকটা ছিল আমরা তিন-চার জন পড়াশুনা ছেড়ে তার পেছনে পেছনে ঘুরেছিলাম ম্যাজিক শেখবার আশায়, কিন্তু ম্যাজিক শেখাতো হ'লই না, মাঝখান থেকে পড়ায় ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে দাদার কাছে অপমানিত হ'তে হয়েছিল। অবশ্য সে লোকটা চলে গেলে আমরাও

একটা টিনের বাক্স, একটা ভাঙ্গা ঘড়ি, নবীনের সংগৃহীত একখণ্ড অস্থি—পিসিমা বলেছিলেন সেটা নিশ্চয় গরুর হাড়—এই সব দিয়ে একটা ম্যাজিক দেখাবার দল তৈরী করেছিলাম। কিন্তু দর্শকদের ইচ্ছা এবং সহযোগ না থাকলে সে ম্যাজিক দেখিয়ে তাদের আশ্চর্য্য ক'রে দেবার কোন উপায় ছিল না। বস্তুত তিনু টেপি প্রভৃতি দর্শকেরা যা দেখে সব চেয়ে আনন্দ পেত সে হচ্ছে—নবীনের ডিগ্‌বাজী। যাহোক পিসিমা সেই গরুর হাড়ের কথাটা অভিভাবকদের কানে তুলে দেওয়াতে আমাদের ম্যাজিকের দল ভেঙ্গে দিতে হ'ল। আজ মনে হ'ল যদি সেই ম্যাজিকওয়ালার মত ম্যাজিক দেখাতে পারতাম তবে আমাকে সে ভাল না বেসে থাকতে পারত না। এমনি ক'রে কয়েকদিন গেল। তার পর রাখালের কাছে খবর পেলাম যে তাঁরা চলে যাচ্ছেন—পরের দিন সকাল বেলা। স্থির করলাম যাবার আগে কোন রকমে আর একবার দেখা ক'রে বিদায় নিতে হবে। বিজয়া দশমীর ভোরের বেলায় সানাইয়ের করুণ সুর শরৎ-আকাশকে যেমন করে কানায় কানায় বিদায় ব্যথায় ভরে দেয়, মনটা তেমনি ক'রে ব্যথায় ভরে গেল।

পরদিন খুব ভোরে উঠলাম। নবীনকে সঙ্গে নিলাম, বললাম চল্ মর্নিং ওয়াকে। ইচ্ছা ছিল সেদিন বেশভূষার যথাসাধ্য পারিপাট্য করব। কিন্তু বাক্সের চাবি ছিল মায়ের হাতে। সাজসজ্জার কোন সরঞ্জামই আয়ত্তে ছিল না। তবে শিশিতে

সুগন্ধি তেল ছিল, তার অনেকটা মাথায় ঢেলে চক্‌চকে করে তুললাম। মাথা আঁচড়ান আমাদের নিষেধ ছিল না বটে, কিন্তু সিঁথি করা নিষেধ ছিল। কিন্তু সেদিন কে কার শাসন-বারণ মানে? অনেকক্ষণ ধ'রে বেশ ক'রে সিঁথি করলাম। পরনের কাপড়টা ময়লা হ'লেও কোঁচা দিয়ে পরলাম। গায়ে সেই ফ্লানেলের শার্টটা। শার্ট ধুতির অপ্রতুল থাক, মোজা ছিল দুজোড়া। একজোড়া নিজের লম্বা মোজা, সেটা পায়ে দিয়ে তার উপর আলনায় দাদার পরিত্যক্ত একজোড়া ছেঁড়া সিল্কের মোজা ছিল, সেটাও পায়ে দিয়ে নিলাম। খিড়কী দরজা দিয়ে বাড়ী থেকে বেরুলাম। যাবার সময় কোন কিছু বিঘ্ন হলনা বটে কিন্তু নবীনকে নিয়ে পড়লাম মুস্কিলে। একেতো তার কাপড় চোপড় অতি অভদ্র রকমের, তার উপর তার ইচ্ছা ছিল যে যদি মর্নিং ওয়াকে যেতেই হয় তবে নদীর ধারে না গিয়ে দাসেদের পুকুরের ধারে যাওয়া যাক, কারণ সেদিকে ভোরের বেলায় খেজুরের রস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বেচারা নবীন আমার কাছ থেকে অনেক ঘুড়ি, সিগারেটের ছবি পেয়েছে, আজ সে কি করে নিমকহারামী করে—অতএব চলল সঙ্গে। কিন্তু পথের ধারে যতগুলো বুনো কুলগাছ ছিল প্রত্যেকটাতে দু-চারটে ঢিল ছুড়ল এবং দু-চারটে কুল কুড়োল। এমনি ক'রে নদীর ধারে যেতে দেরী হয়ে গেল।

উঁচু সরকারী বাঁধা রাস্তা দিয়ে নদীর ঘাটের দিকে

যাচ্ছিলাম। রাস্তার পাশে বাঁশঝাড়ের মাথার উপর তখন সবেমাত্র একটুখানি রোদ এসে পড়েছিল, অন্য ধারে দূর বিস্তৃত মাঠের শেষে ভিন্ন গ্রামের গাছের সবুজ রেখা কুয়াশায় ঝাপ্‌সা। মাঠে কলাই খেতের উপর বড় বড় ফোঁটা ফোঁটা শিশির তখনও শুকোয়নি। মাঠের মাঝখানে ইটের পাঁজার উপর গোটা কয়েক বাব্‌লা গাছ। একটা মরা খেজুর গাছের উপর একটা ঘুঘু ক্রমাগত বুক আছড়ে আছড়ে ডাকছিল। হঠাৎ নবীন তার দিকে একটা ঢিল ছুড়ে দিল, ঘুঘুটা পাখার শব্দ ক'রে শাদা পালকের ঝলক দিয়ে খাড়া আকাশে উঠল, তারপর খানিকটা নেমে দূরে উড়ে গেল। ক্রমে বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিকে মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে নদীর ইস্পাত-ধূসর জল এবং দূরে শাদা বালির চরটা দেখা যেতে লাগল। এমন সময় একখানা পালকী এল। আমরা পথ ছেড়ে দিলাম, পালকীখানা নদীর দিকে চলে গেল। পালকীর দরজার ফাঁক দিয়ে খানিকটা শাড়ী ও খানিকটা চওড়া লালপাড় দেখতে পেলাম। আর নদীর দিকে গেলাম না। ভাবলাম সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে আমি তারি জন্য অপেক্ষা করছিলাম। দাঁড়িয়ে রইলাম—নবীন কি-একটা কথা বলছিল তা আমার কাণেও পৌঁছল না। খানিকক্ষণ পরে দেখি রাখাল আসছে। এক হাতে একটা হারিকেন লণ্ঠন, আর-এক হাতে একটা মুখে-সরা-বাঁধা হাঁড়ি, পিঠে একটা ছোট পুঁটুলি। কোন রকমে মাঝে মাঝে থেমে, জিনিষ নামিয়ে হাত বদলে এবং

নিজের বারংবার খসে পড়া কাপড়ের বাঁধ বার বার এঁটে সে আসছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম—রাখু, পালকীতে কে গেলরে ?

সে বললে—দিদিমা।

আর তোর মাসীমা ?

তিনি অনেকক্ষণ আগেই গেছেন।

অমল চুপ করল।

আমি বললাম—তার পর ?

সে বলল—তার পর আর কিছু নেই।

—সে কি হে ?

সে বলল—তার দিন সাতেক পরে একটা ক্রিকেট ম্যাচ নিয়ে এমন মেতে গিয়েছিলাম যে ও ঘটনা ভুলেই গেলাম। এমন কি রাখালকে যে লাটাইটা দিয়েছিলাম সেটাও ফিরিয়ে নিলাম।

সুরেশ জিজ্ঞাসা করল—আর কখনও তাঁকে দেখেছ ?

অমল অনেকক্ষণ ধ'রে একটা চুরুট ধরাল। দেশলাইয়ের আলোতে তার চশমার কাঁচ দুটো চক্ চক্ ক'রে উঠল। তার পর থেমে বলল—পরশু দিন দেখে এসেছি—ওজনে দুমণের উপরে এবং চার পাঁচ ছেলের মা। আর সুরেশ এবং মদনদা তর্ক

আরম্ভ করার পূর্ব্বে আমি শুধু এই কথা ব'লে রাখতে চাই যে, যে মনোভাবের ইতিহাস তোমাদের বললাম—সেটা মোহ হ'তে পারে, কিন্তু আমি শপথ ক'রে বলতে পারি সেটা রূপজ মোহ নয়। দ্বিতীয়ত আমি প্রথম থেকেই বিয়ে করতে প্রস্তুত ছিলাম অতএব ওটাকে অবৈধ বা অন্যায় বলাও ঠিক হবে না।

কিন্তু তর্ক করবার কারও প্রবৃত্তি ছিল না। যেমন চুপ ক'রে ব'সেছিলাম আমরা তেমনি বসে রইলাম। অমল গল্প শেষ করতেই খেয়াল হল যে সমস্ত পাড়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। দেখলাম সমস্ত আকাশ একেবারে নির্মেঘ—কৃষ্ণচূড়া গাছটার ঠিক উপরে কৃষ্ণ-পক্ষের বাঁকা চাঁদ স্বপ্নের মত ক্ষীণ সুদূর আর আকাশময় ছড়ান তারা। তার পর হঠাৎ সুনীল গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বলল—সাড়ে দশটা বেজে গেছে আর ট্রাম পাবার আশা নেই—সমস্ত পথটাই হাঁটতে হবে।"

অমলের গল্পে আমরা সবাই বিরক্তি বোধ করছিলাম বটে, কিন্তু মদন-দা সত্যি সত্যি রাগ করলেন, তিনি সেই থেকে আমাদের ত্যাগ করলেন।

কাহিনী

ইছামতী নদীর তীরে—ইছামতী যেখানে পদ্মার সঙ্গে মিশেছে তার প্রায় আট নয় মাইল দক্ষিণ-পূবে মহালক্ষ্মীপুর গ্রাম। চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বেও ইছামতীতে ষ্টিমার যাতায়াত করত। কিন্তু ইছামতী আর সে ইছামতী নাই। প্রায় মজে গেছে। ষ্টিমার এখন অন্যপথ দিয়ে চলাচল করে। মহালক্ষ্মীপুরের কাছেই আমাদের গ্রাম—হাঁসখালি—যে হাঁসখালি ইউনিয়ান বোর্ডের সভাপতি সেদিন দরবারে রূপার মেডেল পেয়েছেন—সেই হাঁসখালি। কলিকাতা থেকে আমাদের বাড়ী যেতে হ'লে ট্রেণ থেকে নেমে নৌকা নিতে হয়। নৌকা ক'রে বহরে গিয়ে নামি। বহর ইছামতীর উপর। বর্ষাকালে যখন খাল-বিল ভেসে যায় তখন বিলের মধ্যে দিয়ে গেলে শিবরামপুর ষ্টেশন থেকে বিকেলের মধ্যেই বহর পৌঁছন যায়। কিন্তু অন্য সময়ে অল্প জলে লগি দিয়ে কচুরিপানা ঠেলে ঠেলে ইছামতীর বাঁক ঘুরে ঘুরে বহর পৌঁছতে রাত্রি হয়ে যায়। বহর থেকে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ধ'রে মাইল পাঁচেক গেলে হাঁসখালি। বহর পৌঁছতে রাত্রি বেশী হয়ে গেলে নৌকাতেই শুয়ে থাকি। তার পর শেষরাত্রে বাড়ীর দিকে রওনা হই। আর বেশী রাত্রি না হ'লে এবং সঙ্গী জুটলে অথবা চাঁদনী রাত্রি থাকলে রাত্রেই নৌকা থেকে নেমে পড়ি।

এই বহর থেকে হাঁসখালির মাঝামাঝি পথে—মহালক্ষ্মীপুর। অবশ্য মহালক্ষ্মীপুর এখন আর নেই। আছে বহুদূর বিস্তৃত উঁচু-নীচু মাটির ঢিবি—ইতস্তত ছড়ান পুরোনো কালের ইট, মজে

যাওয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলাশয়—সেগুলোকে আর দীঘি ব'লে চেনা যায় না। বিল ব'লে মনে হয়। আর আছে নিবিড় জঙ্গল। বাঁশবনের মাঝে মাঝে দুএকটা কুঁড়েঘর। সবশুদ্ধ বোধ হয় পাঁচসাত ঘর লোক হবে না। প্রায় দুই তিন মাইল জুড়ে জঙ্গল। আম জাম কাঁঠাল বাঁশবন, বড় বড় বট অশ্বত্থ গাছ—নীচে বেতবন একেবারে পুরোনো পুকুরগুলির কল্‌মীদাম পর্য্যন্ত। আর আছে লতা—লতাতে বড় বড় গাছ পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে—সে লতায় হাতী বাঁধা যায়—এমন শক্ত সে লতা। সেই মহাবনের মধ্যে হঠাৎ দেখা যায় কৃষ্ণচূড়া ও পলাশ গাছে ফুল ফুটে লাল হ'য়ে উঠেছে। অথবা প্রস্ফুটিত চাঁপার গন্ধে বাতাস মন্থর। কোথাও বা ঝুমকা, স্থলপদ্ম অথবা রাশি রাশি জবা ফুটে রয়েছে। দীঘির জলে দেখা যায় কল্‌মী পানা ও পাণিফলের মধ্যে রক্ত-শাপলা ও শাদা পদ্ম। এ সকল ফুল ও গাছ এ দেশে জন্মে না। বেশ বোঝা যায় যে বহু অতীতকালে এখানে বহু মানুষের বসতি ছিল। শোনা যায় এই বনের মধ্যে লতাগুল্মে ঢাকা এখনও এক আধটা থাম বা খিলান দাঁড়িয়ে আছে। আরও প্রবাদ যে এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘড়ায় প্রাচীনকালের সোনা রূপার অসংখ্য মুদ্রা সঞ্চিত রয়েছে। কিন্তু সেখানে প্রবেশ করে কার সাধ্য! অসংখ্য গোখরা ও শঙ্খচূড় সাপ সেখানে বাসা বেঁধেছে। লোকে মনে করে সেই ধনরত্ন পাহারা দিচ্ছে। সন্ধ্যাবেলায় নানা দিক থেকে আকাশ ছেয়ে হাজার হাজার বাদুড় আসে বড় বড়

গাছে আশ্রয় নিতে। মাঝে মাঝে বাগ্দীরা হৈ হৈ করে প্রকাণ্ড দাঁতাল শুয়োর মারে। শীতকালে চিতাবাঘের উপদ্রব হয়। পূর্ব্বেই বলেছি বাড়ী যাবার সময়ে রাত হয়ে গেলে—এই জায়গাটা পার হ'তে লোকে ভয় পায়। কেউ যে কিছু দেখেছে তা নয়—তবু ভয় পায়। কেন ভয় পায়—তা' পরে বলছি। অন্ধকার হয়ে এলে—দূরের হাট থেকে ফেরবার মুখে সাহসী লোকেরাও এ জায়গাটা হন হন ক'রে পার হয়ে যায়। অন্য লোকেরা বনের বাইরে দলের লোকদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকে। দু'তিনশ বছর আগে গ্রামের নীচেই ছিল ইছামতী—এখন নদী প্রায় দুই মাইল স'রে গেছে। তবু এখনও ঘাটের নাম গজ-ঘাটা—রাজাদের হাতী স্নান করত ব'লে। তার একটু দূরে দেবী ঘাট যেখানে বিজয়া দশমীতে পঞ্চাশ দাঁড়ের ছিপেতে দেবীকে উঠান হ'ত। তার পরে সতীদহ—তার পরে শ্মশান। নদীর ধারের মাঠটাকে এখনও লোকে ঢালীর মাঠ বলে।

মহালক্ষ্মীপুরের রঘুরাম রায়, তাঁর পুত্র জনার্দ্দন রায়, তাঁর পুত্র রামলোচন রায় সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত জমীদার ছিলেন। বাংলার ইতিহাসে অবশ্য তাঁদের নাম পাবে না। কিন্তু সে দোষ তাঁদের নয়—যারা ইতিহাস লেখে তাদের। তবে একথা নিশ্চিত যে যদি কখনও বাংলার সত্যিকার ইতিহাস লেখা হয় তখন তাতে মহালক্ষ্মীপুরের রাজাদের নাম থাকবেই থাকবে—আর থাকবে শেষ রাজা সহদেব রায়ের স্ত্রী রাণী মহামায়ার নাম,

যাঁর প্ররোচনায় মধুগঞ্জের কুঠির হে সাহেবকে হত্যা করা হয়েছিল ব'লে প্রবাদ। কারণ হে সাহেব নাকি বামুনের মেয়ে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলেন। হে সাহেব সত্যি এ কাজ করেছিলেন কিনা তাও বলা কঠিন কারণ সেকালে এত সাক্ষী-সাবুদ আইন-কানুন ছিল না। লোকের মনে যা সন্দেহ হ'ত তাই সত্যি বলে বিশ্বাস করত।

কান্তাবতীর পূব পার থেকে ধবলেশ্বরীর পশ্চিম পার পর্য্যন্ত সমস্ত পরগণাগুলি মহালক্ষ্মীপুরের রাজাদের ছিল। রাজাই ত বটে। সুদূর গৌড়ে বা মুরশিদাবাদে যে বাদশা বা নবাবসুবেদার থাকতেন তাঁকে কেউ বড় জানত না। দেশের জমীদারকেই লোকে রাজা বলে জানত। তাঁরা সত্য সত্যই রাজত্ব করতেন। লোকের জীবন মরণের মালিক ছিলেন। সৈন্য-সামন্ত, নৌবহর হাতী-ঘোড়া ছিল। লাঠি সড়কি ছিল। বন্দুক এমন কি দু' চারটে কামানও ছিল। মহালক্ষ্মীপুরের রাজবংশের মত অত্যাচারী দুর্দ্ধর্ষ জমীদারবংশ ও অঞ্চলে ছিল না বললেই হয়। হাতী দিয়ে ঘর ভেঙ্গে মানুষ খুন ক'রে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে কত লোকের কত সর্ব্বনাশ যে তারা করেছে তার ঠিকানা নাই। পাশাপাশি জমীদারদের সঙ্গে ছোটখাটো যুদ্ধ ত লেগেই থাকত। মুরশিদকুলি খাঁর সময়ে কিছুদিন চুপচাপ থাকতে হয়েছিল। তারপর আবার যে কে সেই। ইছামতী যেখানে পদ্মার সঙ্গে মিশেছে নৌকায় সে জায়গাটা পার হ'তে রাজাদের নজর না দিয়ে যেতে সাহস

পেত এমন বুকের পাটা কারো ছিল না। এমন কি ঢাকা থেকে যখন মুরশিদাবাদে নবাবী খাজনা চালান যেত তখন নবাবী নৌকাকেও নজর দিয়ে ছাড়-পত্র নিয়ে ইছামতীর মোহনা পার হ'তে হ'ত।

তবে সে সব দু'তিনশ' বছর আগেকার কথা। কোম্পানীর আমল আরম্ভ হবারও পূর্ব্বে। তার পর এক যুগ চ'লে গেছে। বাংলার সেই অর্দ্ধ-স্বাধীন দুর্দ্ধর্ষ জমীদারেরা লোপ পেয়েছে। ভালই হয়েছে। লোকে সুখে শান্তিতে বাস করতে পারছে। সকলেরই জন্যে এক আইন। রাজাই হও বা প্রজাই হও কেউ কারো উপর অত্যাচার করতে পারে না ঃ থানা আছে, ইউনিয়ান বোর্ড আছে। আজ কোথায় সেই জনার্দ্দন রায় যিনি কেদার রায়কে সাহায্য করতে গিয়ে মোগলদের হাতে প্রাণ হারান। কোথায় সেই রামলোচন রায় যিনি এক দিন কূটযুদ্ধে মগদস্যুদের পদ্মা থেকে ইছামতী নদীতে ভুলিয়ে এনে—কালবোশেখীর প্রচণ্ড ঝড়ে বাজপাখীর মত তাদের অতর্কিত আক্রমণ ক'রে তাদের নৌকা বিধ্বস্ত ক'রে ইছামতীর অতল জলে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। মাত্র একটি মগী নৌকা কোন রকমে সেই সর্ব্বনাশ থেকে বাঁচতে সমর্থ হয়েছিল। যাই হোক—তারা যে নাই—সেজন্য দুঃখ নাই। এখন যুদ্ধবিগ্রহ নাই—দেশে পূর্ণ শান্তি। দেশে দস্যুভীতি নাই—অতএব দস্যু নিবারণের জন্য সর্ব্বদা লাঠি-সড়কি নিয়ে প্রস্তুত থাকবার প্রয়োজন নাই। প্রজা দোহাই

না মানলে এমন কি বিদ্রোহী হ'লেও এখন যারা দেশের জমীদার —স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট যাঁদের উপাধি দিয়েছেন—তাঁরাও হাতী দিয়ে ঘর ভেঙ্গে দেন না, লোককে পিঠমোড়া ক'রে দেউড়ীতে কয়েদ রাখেন না অথবা গুণে গুণে পঞ্চাশ জুতাও মারেন না। তাঁরা সঙ্গত ধারা অনুসারে সদরে নালিশ করেন। বস্তুতঃ তিন তিন বছর পরে ইউনিয়ান বোর্ডের ইলেক্‌শান ছাড়া আমাদের দেশে সে রকম কোন উত্তেজনার কারণই ঘটে না।

কান্তাবতী নদী কবে শুকিয়ে গিয়েছে—কোথাও সুজলা সুফলা শস্যক্ষেত্র; কোথাও-বা বিল হয়ে গিয়েছে। রেণেলের ম্যাপে ভিন্ন অন্য কোথাও তার চিহ্নমাত্র নাই। ইছামতী আছে— কিন্তু ইছামতীর সে জলরাশি নাই। আজ তার ক্ষীণ ধারা পানা ও শেওলায় মন্দগতি। মধুগঞ্জে হে-সাহেবের সেই কুঠি কোন্ কালে নদীতে ভেঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। যেখানে কুঠির বাগান ছিল সেখানে কেবল গোটা দুই তিন ঝাউ গাছ অবশিষ্ট আছে আর তার নীচে লোহার পাতের তৈরি প্রকাণ্ড একটা হৌস আছে—সেটা দিয়ে যে কি হ'ত তা কেউ জানে না।

কোম্পানীর রাজত্ব আরম্ভ হবার সময়ে মহালক্ষ্মীপুরের রাজারা দুই ভাই ছিলেন। বড় রাজা সহদেব রায়ের বয়স ত্রিশ, ছোট রাজা কীর্ত্তি রায়ের বয়স বাইশ কি তেইশ। সহদেবের সুন্দর পুরুষোচিত চেহারা, রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। দীর্ঘ আয়ত চক্ষু, বাবরিকাটা চুল—একটু স্থূলকায়, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। বীর্য্য অপেক্ষা

কৌশলের জন্য প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বপুরুষ যেখানে গায়ের জোরে রাজ্যবিস্তার করতেন সহদেব সেখানে নবাব সরকারে ফৌজদারের নিকট দরবার ক'রে কার্য্যসিদ্ধি করতেন।

তখন পূজার সময়। দেবীপক্ষ। বোধন হয়ে গেছে। পাঁচ শত ঢাক ঢোল সানাই কাঁসর বাজিয়ে বিপুল দশভুজা প্রতিমা খাটে উঠান হয়েছে। দেবীর মাথায় রত্নখচিত বৃহৎ সোণার মুকুট ঝলমল করছে। তাঁর সর্ব্বাঙ্গে সোণা জহরতের অলঙ্কার। বারোদুয়ারী সিংহদ্বারের তিন-তলায় নহবৎখানায় প্রহরে প্রহরে নহবৎ বাজছে। তখনও সূর্য্য ওঠে নাই। শ্বেতপাথরের বাঁধান চাতালে কালো কষ্টিপাথরের জলচৌকীর উপর ব'সে সহদেব মুখ হাত ধুয়ে সকালবেলাকার আহ্নিকের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। হরিহর পাঠক এসে কেঁদে পড়লেন। পাগলের মত চেহারা, পরণের কাপড় ছিন্নভিন্ন। গায়ে ধূলা ও রক্তের চিহ্ন। ব্রাহ্মণ উন্মাদের মত সারা রাত কোথায় কোথায় ঘুরেছেন তার ঠিকানা নাই। ব্যাপার এই—হরিহর পাঠকের বিধবা কন্যা কাল রাণীদীঘিতে জল আনতে গিয়েছিল। রাণীদীঘি গ্রামের সীমানার একটু বাইরে, জায়গাটাও নির্জ্জন। তা'তে গ্রামের সমস্ত লোক প্রতিমা দর্শনের জন্যে রাজবাড়ীতে চ'লে যাওয়ায় পথে-ঘাটে একেবারে লোক ছিল না। মেয়েটি আর বাড়ী ফেরে নাই। যেরূপ শোনা গেল—ডাকাতে নিয়ে যাওয়ারই সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণ অসংলগ্ন ও উত্তেজিতভাবে যা বললেন সহদেব সবই শুনলেন, তার পর

অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। শেষে ভৃত্যকে বললেন—আহ্নিকের আয়োজন কর।

হরিহর লাল দুটি চক্ষু সহদেবের মুখের উপর রেখে বললেন—সহদেব, তা হ'লে তুমি কিছু করবে না?

সহদেব বললেন—ঠাকুর, কি করব ভেবে দেখি।

হরিহর চীৎকার ক'রে বললেন—ভেবে দেখবে? তোমার বাপঠাকুর্দ্দা হ'লে ভেবে দেখত না—এক মুহূর্ত্তে বুঝতে পারত। তুমি নিতান্ত অপদার্থ তাই ব্রাহ্মণের অপমান শুনেও চুপ ক'রে বসে আছ।

সহদেব বললেন—ঠাকুর ও মেয়েকে তো আপনি আর ঘরে নেবেন না—তা হ'লে—

হরিহর গর্জ্জে উঠলেন। বললেন—তুমি দেশের রাজা—তুমি তাকে উদ্ধার ক'রে দাও—তারপর আমি তাকে গঙ্গায় ডুবিয়ে দেবো। কিন্তু তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর।

হরিহরের মেয়ের কথাটা রাত্রেই সহদেবের কানে গিয়েছিল। তিনি ব্যাপারটা কতক আন্দাজও করেছিলেন। সমস্ত দিক বিবেচনা না ক'রে কথা বলা তাঁর অভ্যাস ছিল না—কাজেই তিনি চুপ করে রইলেন। হরিহর ঝড়ের মতন অন্দরের দিকে চলে গেলেন।

রাণী মহামায়া তখন সদ্য স্নান শেষ ক'রে ভোগ সাজাতে বসবেন, এমন সময়ে বিশৃঙ্খল চুল, রক্তচক্ষু উন্মাদের মত হরিহর

গিয়ে সামনে দাঁড়ালেন। মহামায়া গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করতে উদ্যত হ'তেই হরিহর বললেন—মা, আমাকে প্রণাম কোরো না—আমি অশুচি।

মহামায়া সংক্ষেপে সকল কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলেন—কর্ত্তা?

হরিহর বললেন—তাকে ব'লে লাভ নেই। আমি তোমার কাছে বিচার চাই। সে রাজা—তুমি রাণী নও? স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম তুমি রাখবে না?

মহামায়া স্বামীকে জানতেন। জানতেন বহু পরামর্শ আলোচনা না ক'রে তিনি নড়বেন না। তাই সংক্ষেপে দাসীকে আদেশ দিলেন—দেওয়ানজীকে ডাকতে পাঠাও আর কর্ত্তাকে খবর দাও। আমি কথা বলতে চাই।

ষষ্ঠীপূজার সন্ধ্যাবেলা চরের মুখে খবর পাওয়া গেল কুমোর-পাড়ার লোকেরা একখানা ডুলি কুঠির দিকে যেতে দেখেছে। ডুলির সঙ্গে কুঠির পাইক। ডুলি থেকে কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। কথাটা সম্ভবও মনে হ'ল কারণ সাধারণ ডাকাতের এত সাহস বা সাধ্য ছিল না যে মহালক্ষ্মীপুর থেকে মেয়ে চুরি ক'রে নিয়ে যায়।

দেওয়ান হরগোবিন্দের ইচ্ছা ছিল না যে এই ব্যাপার নিয়ে বেশী কিছু করা হয়। বিশেষতঃ ইংরেজ কুঠিয়ালের সঙ্গে বিবাদ। স্বর্গীয় কর্ত্তাদের আমলের কথা স্বতন্ত্র। সে সময়ে এত কড়াকড়ি ছিল না। দশ বছর হয়নি পলাশীর মাঠে লড়াই জিতে ওরা

এক নবাবকে সরিয়ে মুরশিদাবাদের সিংহাসনে অন্য নবাব বসিয়েছে। কুঠিতে কুঠিতে দেশ ছেয়ে ফেলছে। বন্দরে বন্দরে নৌকার মাস্তুলে ইংরেজের নিশান। সে সকল নৌকার নজর আদায় করা দূরে থাক, খাজনাই আদায় করা যায় না। এই সেদিন ফিরিঙ্গীরা ভুবনডাঙ্গার ঘোষাল বাবুদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল। অপরাধ তাঁরা চিরপ্রথামত কুঠি বসাতে দেওয়ার পূর্ব্বে নজর দাবী করেছিলেন। মুরশিদাবাদে মহালক্ষ্মীপুরের যে উকীল ছিলেন তিনিও ইংরেজদের সম্বন্ধে এবং দেশের অবস্থার বিষয়ে যা লিখেছিলেন তাতে ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদ করা মানে যে নিজেদের সর্ব্বনাশ ডেকে আনা—এ বিষয়ে রাজা সহদেব বা দেওয়ান হরগোবিন্দের কারো মনে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মহামায়া পাথরের মতন কঠিন হয়ে রইলেন। অন্নজল ত্যাগ ক'রে শয্যা গ্রহণ করলেন। স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গেল। প্রজা রক্ষা না করতে পারলে রাজত্ব করার অর্থ তিনি কিছুতেই বুঝতে পারলেন না। দেওয়ান হরগোবিন্দ নিরুপায় হয়ে টাকে হাত বুলুতে লাগলেন। ছোট রাজা কীর্ত্তি রায় দাদার চেয়ে মাথায় বড়। ধপধপে গৌর বর্ণ। ছিপছিপে বলিষ্ঠ চেহারা। পার্শী ও সহবত শিখতে মুরশিদাবাদ গিয়েছিলেন। শিক্ষা যথাসম্ভব সমাপ্ত হয়ে গেলেও বাড়ীতে ফেরবার নাম করেন না। অনেক কষ্টে সেখান থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। অত বয়স হয়েছে অথচ বিবাহ

করেন নি। এদিকে বড় ভাইও অপুত্রক। কীর্ত্তি রায় সিরাজউদ্দৌলার অনুগৃহীত অনুচরদের মধ্যে একজন ছিলেন ব'লে শোনা যায়। সমস্ত দিন নানা রকমের অসংখ্য পায়রা ও ঘুড়ি ওড়ান অথবা বনে জঙ্গলে নদীতে শিকার ক'রে ফেরেন। আর রাত্রে সেতার বাজান। মুরশিদাবাদ থেকে একজন মুসলমান ওস্তাদ এনেছেন তার কাছে গান শেখেন। রাজধানীতে দীর্ঘকাল থাকার দরুণ আচার ব্যবহার অনেকটা মুসলমানী ধরণের। ব্রাহ্মণের ছেলে—অথচ পূজোআচ্চা করেন না। বিষয় কর্ম্মেও মন নাই। বড় ভাই সহদেব থেকে আরম্ভ ক'রে সকলেই তাঁর আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। সহদেব কাশী চলে যাওয়ার ভয় দেখিয়েও বিষয় কর্ম্মে তাঁকে মন দেওয়াতে পারেন নি। ইছামতীর ঘাটে প্রকাণ্ড দুই তিনখানা বজরা বাঁধা। ইয়ার বকসি নিয়ে তিনি সেখানে বাসা নিয়েছেন। বজরার ছাদে নিবিষ্ট মনে দাবা খেলছেন এমন সময়ে পাইক এসে খবর দিল রাণীমা ডাকছেন। হরিহরের মেয়ের কথাটা তাঁর কানে গেল। দেওয়ান হরগোবিন্দের পরামর্শে দাদা সে বিষয়ের প্রতিকার করছেন না—এ কথাটাও শুনলেন। ফিরিঙ্গীকে সিরাজউদ্দৌলার সামনে কুর্ণিশ করতে দেখেছেন ; তাই পলাশীর মাঠের ব্যাপারটাকে তিনি চূড়ান্ত মীমাংসা ব'লে মেনে নিতে পারেন নি। সকল কথা শুনে তিনি আগুন হয়ে উঠলেন। বৌ-ঠাকুরাণীর সহায়তা সত্ত্বেও মন্ত্রণা সভায় দাদা ও দেওয়ানের

সঙ্গে পেরে উঠলেন না। দাদাকে কিছু বলতে পারলেন না। কিন্তু ইচ্ছা হ'ল হরগোবিন্দের মুণ্ডটা চূর্ণ করে দেন। বিষয়টা কিন্তু চাপা পড়বার উপক্রম হ'ল। পূজার উৎসব কোলাহল গান-বাজনা ভোজ সারা দিনরাত্রি ধূমধাম সমানে চলল। তবু যাদের চোখ কান আছে তাদের মনে হ'ল যে নির্ম্মল আকাশের কোন প্রান্তে যেন বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে—আকাশে কোথাও এক টুকরা মেঘ নাই অথচ কোথা থেকে যেন মেঘের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

সপ্তমীর দিন পঞ্চাশটি ছাগ মেষ ও দুটো মহিষ বলি হবার কথা। পূর্ব্বকালে জনার্দ্দন রায় লাল চেলি প'রে নিজ হাতে বলি দিতেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রকাণ্ড খাঁড়া তুলতে পারে এমন বলিষ্ঠ পুরুষ কেউ ছিল না। তবু যিনি বলি দিতেন বহুকাল হ'ল তিনি বলি দিচ্ছেন। অবলীলাক্রমে ছাগ মহিষ মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হয়ে দেবীর পূজায় উৎসৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু সপ্তমীর দিন কি যে হ'ল বোঝাই গেল না—মহিষ বেধে গেল। রক্তাক্ত মহিষ হাড়িকাঠ উঠিয়ে দড়িদড়া ছিঁড়ে উঠানে পাগলের মত ইতস্ততঃ ছুটতে লাগল। যদি কীর্ত্তি রায় ও আরও দু'একজন লাফিয়ে প'ড়ে সেই ক্ষিপ্ত মহিষটাকে না ধরে ফেলতেন তা হ'লে সে দিন যে প্রতিমার সামনে মানুষ খুন হ'ত সে বিষয়ে ভুল নাই। সমস্ত লোক হায় হায় করতে লাগল এবং সদর দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে পালাতে লাগল। এক মুহূর্ত্তে সেই পাঁচ শত

ঢাক ঢোল সানাই কাঁসর থেমে গেল। সহদেব রায় পূজার দালানে জোড়হাত করে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মুখ দিয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ বের হ'ল। ঝর ঝর ক'রে তাঁর চক্ষু দিয়ে জল পড়তে লাগল।

কি পাপে যে দেবী বিরূপ হলেন—স্পষ্ট ক'রে মুখে না আনলেও কারও তা বুঝতে বাকি রইল না। কারণ সেই দিনই সকালবেলা রাণীদীঘিতে হরিহরের মৃতদেহ ভাসতে দেখা গিয়েছিল। যা হোক উন্মত্ত ব্রাহ্মণের ভাঙ্গা গলার চীৎকার আর সহ্য করা যাচ্ছিল না। সমস্ত পুনরায় শুচি ক'রে নতুন ক'রে সঙ্কল্প ক'রে পূজা হ'ল। এবার বলিও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'য়ে গেল।

সেই দিন রাজপ্রাসাদের নিভৃত প্রকোষ্ঠে সন্ধ্যাবেলা সহদেব রায়, কীর্ত্তি রায় ও সর্দ্দার মেহের খাঁ মিলে দরজা বন্ধ ক'রে কি পরামর্শ হ'ল—কেউ জানতে পারলে না। তবে অনেক রাত্রি অবধি সে ঘরে আলো জ্বলেছিল এবং 'রাজাদের দুই ভায়ের এক ভাইও আরতির সময়ে ঠাকুরদালানে উপস্থিত হন নি—এটা সকলেই লক্ষ্য করেছিল। বৃদ্ধ হরগোবিন্দ মন্ত্রণার সময়ে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তিনি বিশেষ কোন কথা বলেন নি। বড় রাজাও বিষণ্ন এবং চুপচাপ ছিলেন। কীর্ত্তি রায়ের মুখে একটা চাপা উত্তেজনা ও স্ফূর্ত্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। আর একটা জিনিস সকলেই লক্ষ্য করেছিলেন যে রাণী মহামায়া সেই রাত্রে প্রথম দেবীর প্রসাদ পেলেন।

মেহেরালী খাঁ রাজাদের সেলাম ক'রে বিদায় নিল। মেহেরের বয়স তখন ষাট পার হয়ে গেছে। মাথার বাবরি, গোঁফ দাড়ি পেকে একেবারে শাদা হয়ে গেছে এবং দাঁতগুলো সমস্ত প'ড়ে গেছে কিন্তু পেশীগুলি এখনও যেন ইস্পাতের তৈরি। বেঁটে খাটো লোকটি। সে নিজ হাতে অনেক খুন করেছে। রণপা'র সাহায্যে ঘণ্টায় দশ মাইল দৌড়িয়েছে। নিজের হাতে বিকট উল্লাসে চালের পরে চালে আগুন ধরিয়েছে। নিশীথ রাত্রে তলোয়ার দাঁতে চেপে নিঃশব্দে সাঁতার দিয়ে শত্রুর নৌকার কাছি কেটে তাদের নৌকায় লাফিয়ে উঠেছে। গভীর রাত্রে অকস্মাৎ মেহেরালীর ডাক শুনলে লোকের গায়ের রক্ত জল হয়ে যেত। ডান গালে একটা তলোয়ারের আঘাতের দাগ—তাই হাসলে তাকে আরও ভীষণ দেখাত—বিশেষ করে শত্রুর সামনে যখন সে খল খল করে হাসত। নিজের দলের লোকেরাও তাকে বাঘের মত ভয় করত। সে পাশ দিয়ে গেলে যারা কথা বলছিল তারা কথা বলা বন্ধ ক'রে দিত, যারা হাসছিল তারা হাসি থামিয়ে দিত। মেহের দেউড়ীতে গিয়ে তার শিষ্য স্বরূপ চাঁদ ও নদের চাঁদকে ডেকে পাঠাল।

মহাষ্টমীর রাত্রে ঠাকুরদালানের চকে প্রকাণ্ড উঠানে অসংখ্য ঝাড়, বেল, দেওয়ালগিরি ফানুসের আলোতে সহর থেকে আনীত বাইজীর নাচগান চলছে। লোকে লোকারণ্য। ভৃত্যেরা পান তামাক ফুলের মালা বিতরণ করছে—পিচকারী দিয়ে সকলের

গায়ে গোলাপজল ছিটিয়ে দিচ্ছে। মণ্ডপঘরের খোলা দরজা দিয়ে প্রতিমা দেখা যাচ্ছে। সেখানেও ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে। বাতাসে স্তূপীকৃত লাল শাদা পদ্মফুলের সৌরভ। জরীর মছলন্দের উপর কিংখাবের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে রাজারা দুই ভাই ব'সে আছেন। হুম্ হুম্ করে হে সাহেবের পালকী এসে পৌঁছল—পূজায় তাঁরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল। ছয় বেহারার পালকী, সঙ্গে দুইটি পাইক, দুইটি মশালচী। দেওয়ান সদর দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে গিয়ে সাহেবকে নিয়ে এলেন। রাজাদের পালকী ভিন্ন অন্য কোন পালকীর সে দরজা অতিক্রম করার হুকুম ছিল না। সহদেব উঠে অভ্যর্থনা করে সাহেবকে বসালেন—কীর্ত্তি রায় বসেই রইলেন এবং পারিষদবর্গের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন যেন সাহেবকে তিনি দেখেন নাই। খাস ভৃত্য ফুলের মালা জড়ান সুদীর্ঘ আলবোলায় সুগন্ধী তামাক দিয়ে গেল। হে সাহেব সোণার পানদান হ'তে পান নিলেন, আতরপাশ থেকে আঙ্গুলে আতর মেখে নিলেন এবং আস্তে আস্তে আলবোলায় তামাক খেতে লাগলেন। গানের পর গান চলছিল। সুরের মধ্যে আর ফাঁক পড়ছিল না। সেই দীপালোকিত আসরে, ফুলের গন্ধে, সুরের মাধুর্য্যে সুর্ম্মা-আঁকা ডাগর চোখের বিলোল কটাক্ষে রূপসী নর্ত্তকী মোহের সঞ্চার করছিল। সাহেব উত্তেজিত হয়ে বারংবার উচ্ছ্বসিত বাহবা দিতে লাগলেন। সাহেবের জন্য স্ফটিক পাত্রে পারস্য হতে আনীত সুন্দর সুরা দিয়ে গেল। তিনি

ধীরে ধীরে আস্বাদন ক'রে তা পান করছিলেন। মনে হ'ল নর্ত্তকীর সকল লাস্যের সকল ভ্রুবিলাসের সকল সঙ্গীতের উদ্দেশ্য তিনি। অনেক রাত পর্য্যন্ত থেকে প্রতিমা প্রণামী দশ মোহর ও বাইজীর বকসিস পাঁচ মোহর দিয়ে হে সাহেব বিদায় নিলেন। যাবার সময় জানিয়ে গেলেন যে রাজবাড়ীর পালা শেষ হ'লে তিনি কুঠিতে বাইজীর নাচের বায়না দেবেন। বাইজী বহু আঙটিপরা আঙ্গুল হেলিয়ে তাঁকে সেলাম করল। দেওয়ানজী রাজবাড়ীর ফটক পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

সাহেবের পালকী যখন রাজবাড়ীর ফটক থেকে বের হ'ল রাত্রি তখন বোধ করি তিন প্রহর। গভীর অন্ধকার রাত্রি। চাঁদ বহুক্ষণ অস্ত গিয়েছে কিন্তু আকাশে অজস্র তারা উঠেছে। গ্রাম ছেড়ে পালকী ইছামতীর ধারে মাঠে পৌঁছল। ঝোপেঝাড়ে অগণিত জোনাকীর দীপালি। বেহারাদের গান আর ঝিল্লীর শব্দ ছাড়া চারিদিকে নিবিড় নিস্তব্ধতা। কেবল বহুদূর থেকে রাজবাড়ীর উৎসবের বাদ্যধ্বনি অতি ক্ষীণ ভাবে শোনা যাচ্ছিল। একদিকে ধু ধু মাঠ, অন্যদিকে অন্ধকার ইছামতী। সাপের গায়ের মত চক চক করছে তার জল। মশালচীরা মশাল জ্বালায় নাই কারণ আলো চোখে লাগলে বেহারারা পথ দেখতে পায় না। মাঠে বুনো খেজুর কুল বাবলার ঝোপ—তার পাশ দিয়েই গেছে রাস্তা। পালকী যেমনি সেই ঝোপের পাশে পৌঁছল একটা বাঁশের ছোট লাঠি বনবন শব্দে ছুটে এসে প্রচণ্ড জোরে

সামনের বেহারার মাথায় পড়ল। অমনি পালকী শুদ্ধ বেহারারা উপুড় হয়ে পড়ল। তারপর অন্ধকারে কারা কালো বাঘের মত পালকী আক্রমণ করল। ডাকাতের ডাক নাই। অতি নিঃশব্দে তারা তাদের কাজ হাঁসিল করল। আক্রান্ত হয়ে বেহারারা, সাহেব বা কুঠির পাইক একটি শব্দও করবার সময় পেল না। তারপর লাস টুকরা টুকরা করে পাথর বেঁধে ইছামতীতে ফেলে দিয়ে পালকী ভেঙ্গে কাঠগুলো নিয়ে ডাকাতেরা ছিপে উঠল। ছিপ অন্ধকারের মধ্যে দ্রুত মিলিয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে বেশী সময় লাগল না। সেই অন্ধকার আকাশের নীচে দূর বিস্তৃত মাঠে ইতস্তত ঝোপেঝাড়ে পূর্ব্ববৎ জোনাকী জ্বলতে লাগল—ঝিল্লী ঝিঁ ঝিঁ করতে লাগল। নির্জ্জন রাত্রে সেই নিঃশব্দ মনুষ্যহত্যার কোন সাক্ষী বা চিহ্ন রইল না। সারারাত্রির গুমোটের পর শেষ রাত্রে বাতাস জেগেছিল—সেই বাতাস-তাড়িত ইছামতীর ঢেউ তীরে লেগে শব্দ হচ্ছিল—ছলাৎ, ছলাৎ।

এই কাহিনীর মোটামুটি ঘটনাগুলি গল্পের আকারে আমাদের ওদিকে শুনতে পাবে—তবে অবশ্য খুঁটিনাটি মেলে না। এক এক জন এক এক রকম বলেন। কেউ বলেন হে সাহেবের সঙ্গের লোকজন একজনও পালাতে পারে নি। একজন বেহারা খানিকটা দূর পর্য্যন্ত দৌড়ে গিয়েছিল—কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে একটা সড়কী এসে তাকে এফোঁর ওফোঁর করে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেলে এবং সেই সঙ্গে কে যেন খল খল

ক'রে হেসে ওঠে। আবার কেউ বলেন একজন লোক গুরুতর আহত হয়েও হামাগুড়ি দিয়ে কাশঝোপের ভিতর ঢুকে লুকিয়ে ছিল এবং সে'ই পরদিন কুঠিতে গিয়ে সব কথা বলে দেয়। রাত্রে ডাকাতেরা ইছামতীতে ফেলবার আগে লাস যখন গুণতি করে তখন উত্তেজনাবশতঃ ভুল করে। তবে এসব কথার সত্যমিথ্যা নির্দ্ধারণ করার উপায়ও নাই—প্রয়োজনও নাই।

এই ঘটনার মাস দুই পরে সহর থেকে কোম্পানীর সিপাহী এসে বড় রাজা সহদেব রায়, দেওয়ান হরগোবিন্দ ও সর্দ্দার মেহের খাঁকে লোহার শিকলে বেঁধে নিয়ে যায়। কীর্ত্তি রায় শিকারে গিয়েছিলেন—সংবাদ পেয়ে তিনি পালিয়ে যান। সেই থেকে তাঁর আর কোন খোঁজই পাওয়া যায় নি। কেউ বলে তিনি উত্তর পশ্চিমে চলে গেছেন—কেউ বলে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। সহদেব রায় অল্পদিন কারাবাসের পর কারাগারেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। হরিহর পাঠকের মেয়ে সংক্রান্ত ঘটনার পর থেকে তিনি আর কখনও পূর্ব্বের মত হন নাই। সর্দ্দার মেহের আলির ফাঁসী হয় সেই খুনে মাঠে। তার কারণ তখনকার কালে নিয়ম ছিল যে অপরাধী যেখানে অপরাধ করবে সেইখানে নিয়ে গিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। সেই থেকে সে মাঠটাকে লোকে ফাঁসীর মাঠ বলে। দীর্ঘ চার বৎসর পরে বৃদ্ধ হরগোবিন্দ ভগ্নদেহে ভগ্নমনে একদিন মহালক্ষ্মীপুরে ফিরে এলেন। যখনই কোন সন্ন্যাসীর দল গ্রামে

বা আশেপাশে আসত হরগোবিন্দ জীর্ণ কম্পিত দেহে লাঠি ভর ক'রে গিয়ে তাঁর ছানি-পড়া চোখের একাগ্র দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীদের নিরীক্ষণ করতেন, কখনও বা তাদের দু'একটা প্রশ্ন করতেন। তিনি রাণী মহামায়াকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের জন্য অনেক অনুনয় করেছিলেন। উত্তরে মহামায়া নাকি বলেছিলেন—বাঘের বংশের উপযুক্ত বাঘের বাচ্চা কোথায় পাবো ?

মহালক্ষ্মীপুরের আদি রাজবংশের শেষ হয় এইরূপে। সেই প্রকাণ্ড রাজপুরীতে একা রইলেন রাণী মহামায়া। তিনি নাকি তারপর অনেকদিন বেঁচেছিলেন। তারপর রাজাদের ভাগিনেয় বংশের শ্রীনাথ ভাদুড়ী সদরে কোম্পানী বাহাদুরকে সেলামি দিয়ে জমীদারীর মালিক হন। কিন্তু মহামায়া যতদিন বেঁচেছিলেন প্রাসাদে প্রবেশ করতেও সাহস পেতেন না। একবার তাঁর পূজার জন্যে তাঁর খাস ভৃত্য রাণীর আদেশ অমান্য ক'রে অন্দরের বাগান থেকে ফুল তুলেছিল। তার ফলে প্রভু ও ভৃত্যকে রাতারাতি ইছামতীর অপর পারে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে হয়েছিল—তারপর অনেক ক'রে ক্ষমা চেয়ে তবে তিনি মহালক্ষ্মীপুরে ফিরে আসবার অনুমতি পান। কিন্তু শ্রীনাথ ভাদুড়ীর বংশেও জমীদারী রইল না। রাজস্ব যথাসময়ে না দেওয়াতে সম্পত্তি নম্বরে নম্বরে নীলামে উঠতে লাগল। রাজার জমীদারী কিনলে দখল পাওয়া যাবে না—এই ভয়ে প্রথম প্রথম

কেউ কিনতে চায় নাই। তারপর হাঁসখালির বাবুরা সেই জমীদারীর অনেক অংশ কিনে নেন।

হাঁসখালির বাবুরাই এখন ও অঞ্চলের জমীদার। বাবুরা কলিকাতায় থাকেন। পুণ্যাহের সময়ে আর নিকেশের সময়ে বাড়ী যান এবং জলহাওয়া ভাল থাকলে পূজার সময়েও যান। সম্প্রতি রাসবিহারী বাবু রায়বাহাদুর উপাধি পেয়েছেন। তাঁর বড় ছেলে সুবোধবাবু জমীদারী দেখেন। তিনি ইতিহাসে এম, এ, এবং বি, এল। চোখে চশমা। ভারি ধীর স্থির মানুষ। বার মাসই অম্বলে ভোগেন এবং ঠাণ্ডার ভয়ে গরম জলে স্নান করেন। বাজেট না ক'রে খরচপত্র করেন না। তাঁর আদেশে এষ্টেটে কোন বেআইনী কাজ হ'তে পারে না। জামীন ছাড়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন না—চেক ছাড়া প্রজার কাছ থেকে একটি পয়সাও নেন না। বলাই বাহুল্য লাঠিয়াল রাখেন না। আসলেই সকলের প্রতি ভারী ভদ্র ব্যবহার করেন।

সেকাল আর নাই। স্ত্রীপুত্র ধনসম্পত্তি নিয়ে বাস করতে কোন প্রকার আশঙ্কা নাই। ছাতা মাথায় দিয়ে ফটক পার হ'তে কোন বিপদ নাই। পালকী ক'রে বাবুদের বাড়ীর উপর দিয়ে চলে যাও না কেন—কেউ কিছু বলবে না। হাঁসখালিরও অনেক উন্নতি হয়েছে। মহালক্ষ্মীপুর ধ্বংস হয়ে যাবার পর বেশীর ভাগ ভদ্রলোকই হাঁসখালিতে উঠে যান। ভদ্রলোকের সুখ স্বচ্ছন্দবাসের জন্যে যা যা দরকার গ্রামে সবই আছে। ইউনিয়ান

বোর্ড, মাইনর স্কুল, ডাকঘর, হাট বাজার—তাতে নিত্যকার জিনিসপত্র ছাড়া অসুখ বিসুখ হ'লে বার্লি ও বেদানাও পাওয়া যায়—এ সব আছে। তদ্ভিন্ন ফুটবল ক্লাব আছে, থিয়েটার পার্টি দুটি আছে। একটা দাতব্য চিকিৎসালয় আছে—তাতে দিন সাত আট জন রোগী বিনা পয়সায় ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের ওষুধ পেয়ে থাকে। গ্রামে একটা হিতসাধনী সভা আছে। তার উৎসাহী সভ্যেরা বছরে একবার ক'রে নিজ হাতে জঙ্গল কাটেন এবং পানীয় জল ফুটিয়ে খাবার জন্যে উপদেশ দিয়ে হ্যাণ্ডবিল বিলি করেন। গ্রামে বাবুদের বাড়ী ছাড়া আরও দু'তিনটে পাকা বাড়ী আছে—অধিকাংশ ভদ্রলোকের বাড়ীই টিনের। গ্রামে ঝগড়াঝাঁটি যে নেই তা নয় তবে তাই ব'লে লোকে খুন খারাপিও করে না—ঘরেও আগুন দেয় না। বেশী কিছু হ'লে ইউনিয়ান বোর্ড আছে—নালিশ করে—তাতে খরচাও অতি সামান্য।

কলিকাতায় আহিরীটোলায় বাবুদের মস্ত চকমিলানো বাড়ী। লোকে সে বাড়ীকেও রাজবাড়ী বলে। তারও দেউড়ীতে সেকালের ঢাল তলোয়ার ঝুলোন আছে, এমন কি দোতালায় ওঠবার সিঁড়ির ধারে কাচের আলমারীতে ইস্পাতের দুই তিনটা বর্ম্মচর্ম্মও দেখতে পাবে। কিন্তু তাতে যদি মনে কর যে বাবুদের পূর্ব্ব পুরুষ পানিপথে বা পলাশীতে যুদ্ধ করেছিলেন তো বিষম ভুল করবে। এঁরা বংশানুক্রমে নির্ব্বিরোধী ভালমানুষ। এই বংশগৌরবের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি বাণিজ্যবীর ছিলেন। পাট

ধান ও তিসির চালানি ব্যবসা করতেন এবং তা থেকেই এ বংশের অর্থ ও উন্নতি। হঠাৎ নীলামে শস্তা পেয়ে ঢাল তলোয়ারগুলো কিনেছিলেন—ঘর সাজাবার জন্যে। এই বংশের আদিপুরুষ পুলিনবিহারী যে একটা পুরুষসিংহ ছিলেন সে কথা তাঁর মৃত্যুর সময়ে সব সংবাদপত্রই একবাক্যে ঘোষণা করেছিল।

অতীতকালের জন্য দুঃখ করি না। কীর্ত্তি রায়ের মত জমীদারের এলাকায় বাস করা খুব সুখের হ'ত বলি না। এই বর্ত্তমান উন্নতির যুগে অত্যাচারী নৃশংস মধ্য-যুগের জমীদারতন্ত্রের যে প্রশংসা করতে চাই না—তাও বোধ হয় কাকেও বোঝাতে হবে না। মেহের আলিখাঁর মত লোক যে আজকাল নেই—সে আমাদের মত ভীরু লোকের পক্ষে ভালই। তবু মহালক্ষ্মী-পুরের গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যখন যাই তখন ঐ প্রচ্ছন্ন চাঁপার গন্ধ, ঝুমকা জবার বিচিত্র বর্ণ, মজা জলাশয়ের একমাত্র প্রস্ফুটিত রক্ত-শাপলা আমার মনকে একেবারে উদাস ক'রে দেয়—এ স্বীকার না ক'রে উপায় নাই।

আর একটা কথা। ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছি—লোকেরা বলে—ঐ জনহীন রাস্তায় রাত্রে যদি কখনও যাও তবে চোখে কিছু দেখতে পাবে না বটে কিন্তু শুনবে। হয় শুনবে দূরে কে যেন ভাঙ্গা গলায় অস্বাভাবিক বুক-ফাটা কান্না কাঁদছে, আর না হয় শুনবে অন্ধকারের মধ্যে থেকে কে যেন হঠাৎ একেবারে কানের পাশে খল খল ক'রে হেসে উঠছে। কিন্তু

তারা কারও অনিষ্ট করে না—বিশেষতঃ যদি বনে ঢোকবার আগেই বনের সীমানায় এসে চেঁচিয়ে বল—দোহাই রাজা সহদেবের, দোহাই রাজা কীর্ত্তি রায়ের ; তবে আর ভয়ের কোন কারণ থাকবে না।

আমি অবশ্য একথা বিশ্বাস করি না। সুবোধ বাবুকে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও বলেন—ও সব বাজে কথা। তা ছাড়া তিনি বলেন মহালক্ষ্মীপুরের ধ্বংসের কাহিনীটার কোন বিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

ক্ষেমী

ক্ষেমী ছিল আমার পিস্‌তুত ননদ। আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমার বয়স ছিল বারো, তার বয়স পাঁচ। একেতো বয়সে ছোট, তারপর শাসন ও শিক্ষার গুণে তার দেহ-মন বয়সের চেয়েও ছোট মনে হ'ত। আমার পিস্‌শাশুড়ী প্রায় সমস্ত জীবনটাই বাপের বাড়ীতেই কাটালেন—ক্ষেমীরও জন্ম হয়েছিল আমার শ্বশুর বাড়ীতে এবং এখানেই সে মানুষ হয়েছিল। ক্ষেমীর না ছিল রূপ, না ছিল কোন গুণ। রং কালো, মাথায় চিরুণী বড় একটা পড়তই না—হাতের নখগুলো যেমনি বড় তেমনি ধারালো এবং ময়লায় পরিপূর্ণ—কাপড় নোঙরা, হাতে দুগাছা কাচের চুড়ি—এই ত রূপ। গুণেরও সীমা ছিল না—দুবেলা খাবার সময়ে ছাড়া তাকে বাড়ীতে দেখা যেত না। কোথায় যে সে ঘুরত—কোন্ আমবাগানে, কাদের কুলগাছের তলায়, কোন্ অজাত-কুজাতের ঘরে, তা আমরা জানতাম না এবং জিজ্ঞেস করলেও সে তার কোন জবাব দিত না, তবে মাঝে মাঝে আমটা জামটা সঞ্চয় ক'রে বাড়ী ফিরত। বাড়ীতেও তার দুরন্তপনার অন্ত ছিল না। শুনতাম ক্ষেমী নাকি ঠাকুর-ঝিদের পুতুল খেলনা চুরি করত—রোদে দেওয়া কাপড় ছিঁড়ে দিত। শাশুড়ী বলতেন—ও মেয়ে ভারি বজ্জাত। ওর পেটে কেবল শয়তানী বুদ্ধি, ও আমার সুরো-নিরোর (ঠাকুরঝিদের) ভাল কাপড় ভাল জামা দেখলে হিংসেতে জ্বলে। মনে আছে আমের দিনে ঠাকুরঝিরা আম খেতে বসেছে—আমি জল থালা

এগিয়ে দিচ্ছি, শাশুড়ী আম টুকরো টুকরো ক'রে ঠাকুরঝিদের থালায় দিচ্ছেন। ক্ষেমী পাড়া বেড়িয়ে এসে চুপচাপ ক'রে পাশে বসল, তারপর যখন দেখল তার আম পাবার কোন আশু সম্ভাবনা নেই তখন নিজের আঁচল থেকে কাঁচা অর্দ্ধেক-খাওয়া একটা আম বের করে তাই খেতে লাগল এবং মাঝে মাঝে আড়চোখে ঠাকুরঝিদের আম খাওয়া দেখতে লাগল। ওপাড়া থেকে বোসেদের বড়বৌ এসেছিলেন, তাঁর মেজ যা'র সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছে সেই কথা বলতে। তিনি বললেন—হ্যাঁলো, কাকেও কিছু খেতে দেখলে অমন করে তাকিয়ে থাকিস কেন? অমন করতে নেই। বড় যা বললেন—ওর স্বভাবই ঐ। যে যখন খাবে ওর ব'সে ব'সে দৃষ্টি দেওয়া চাই, যেন ওকে কেউ কিছু খেতে দেয় না। ক্ষেমী উঠে বাগানের দিকে চলল। শাশুড়ী ডাকলেন—ক্ষেমী আয়, আয়, এই আমটা নিয়ে যা। ক্ষেমী সেদিকে দৃক্‌পাত না ক'রে ধীর পাদবিক্ষেপে অন্দরের বাগানের দিকে চলে গেল। শাশুড়ী বললেন—ভয়ানক জেদী মেয়ে—একগুঁয়ের হদ্দ। পারিবারিক বিগ্রহের সমস্ত কাজই পিসিমা করতেন এবং দিনের সমস্ত সময়ই তিনি ভোগের দালানেই কাটাতেন—শাশুড়ী সেদিকে কটাক্ষ ক'রে বললেন—এই নিয়ে একটা কান্নাকাটির ধূম পড়বে এখন।

চারিদিককার শাসনে ক্ষেমীর মনে সদাই একটা সন্দেহের

ও বিদ্রোহের ভাব জেগে থাকত। এমন অনেক দিন হয়েছে যে তাকে কিছু খেতে দিতে গেলে সে হাত থেকে খাবার ছিনিয়ে নিয়ে গেছে অথবা নিয়েই আঁচলে লুকিয়েছে—পাছে শেষ পর্য্যন্ত তাকে জিনিষটা না দেওয়া হয় এই ভয়ে। আবার এমনও হয়েছে যে যেটা তাকে খেতে দেওয়া হয়েছে সেটা তখন না খেয়ে পরে লুকিয়ে ঢেঁকিশালায় বা বাগানে ব'সে চেখে চেখে সেটাকে খেয়েছে—এর জন্মে অনেকদিন চুরির অপবাদ তার ঘাড়ে পড়েছে—তবু তার অভ্যাস বদলায়নি। মাঝে মাঝে তার সেই চাপা বিদ্রোহ হিংস্র আকারে ফেটে বেরিয়ে পড়ত এবং সেদিন তার আর রক্ষা থাকত না। আমার ছোট ননদ নিরুপমা ক্ষেমীর চেয়ে বছর খানেকের বড়। একদিন সে কি নিয়ে ক্ষেমীকে খুব গালাগালি দিল এবং দুএকটা কিল-চড়ও দিল। আগে আগে ক্ষেমী পিসিমার কাছে নালিশ করত। তিনি বলতেন—আচ্ছা তুমি যাও, বাইরে যাও, ওদের সঙ্গে ঝগড়া কোরো না। ক্ষেমী বুঝেছিল সেদিকে কোন প্রতিকারের আশা নেই। সেই থেকে বাড়ীর কেউ সামনে না থাকলে সেও ঠাকুরঝিদের দু'চার ঘা দিতে ছাড়ত না। সেদিনও সে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ নিরুর চুল ধ'রে তাকে মাটিতে লুটিয়ে দিল। নিরু চীৎকার করে উঠল আর অমনি বাড়ীর সমস্ত লোক হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এল—ওমা এমন দস্যি মেয়ে—আর একটু হলে

নিরু বারান্দা থেকে পড়ে যেত, তাহ'লে কি আর ও মেয়ে রক্ষা পেত। নিরু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ক্ষেমী সেই যে লোক সমাগমে নিরুকে ছেড়ে দিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল, সেইখানেই অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, একটা কথা ব'লেও নিজের দোষ ক্ষালন করবার চেষ্টা করল না। পিসিমা এসে তাকে মারলেন, বললেন—পাজি মেয়ে, আমায় একদণ্ডও শান্তিতে থাকতে দিবি না—রাতদিন তোর জন্যে আমার অশান্তি—মরেও না হতভাগী! পিসিমার দুই চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। একমাত্র আমি সমস্ত ব্যাপারটা দেখেছিলাম। আমি জানতাম ঠাকুরঝিই প্রথম মেরেছে। সে কথা প্রকাশ করতেই সবাই বললেন—তুমি বৌ মানুষ, তোমার সব কথায় কথা বলবার দরকার কি? আর না-হয় দুটো কিলই দিয়েছে, তাই বলে অমন ক'রে চুল ধ'রে মাটিতে শুইয়ে দেবে? একটা কিলের বদলে যে ঠিক কি করা উচিত ছিল সেটা ধার্য্য না হ'লেও সবাই ঠিক জানলেন যে ক্ষেমী একদিন কাউকে না কাউকে খুন করবে। ক্ষেমী কিন্তু সমস্ত চেঁচামেচি গালাগালি অগ্রাহ্য ক'রে যেমন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। তখন শাশুড়ী বললেন—দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি—একবার ডাক ত সুরেনকে। সুরেন আমার দেওর, এ বাড়ীতে সর্ব্বপ্রকার শাসন কার্য্য তাঁর দ্বারা সম্পাদিত হ'ত, তিনি এই দ্বিতীয়বার এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ীতে বসেছিলেন। ঠাকুরপো

এসে ক্ষেমীকে জিজ্ঞেস করলেন—কিরে, নিরুকে মেরেছিস কেন? ক্ষেমী কোন জবাব দিল না—নিস্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। অনেক কিল চড় খেল—তবু একটা কথা বললে না—কেবল তার চোখ-দুটো জলে ভরে এল আর ঠোঁট দুটো ফুলে ফুলে কাঁপতে লাগল। ঠাকুরপো বলতে লাগলেন—বল আর কখনও মারবি? আর কখনও করবি? পিসিমা কাতর হয়ে বললেন—আর করবে না সুরেন, ও আর করবে না, এখন ওকে ছেড়ে দে। ঠাকুরপো বললেন—না পিসিমা, অমনি করেই তো তুমি ওর মাথা খেয়েছ। তারই আঁচলে তার হাত বেঁধে ঠাকুরপো তাকে বাইরে নিয়ে গেলেন—যেন শিক্ষাকার্য্যে কোন বাধা না পড়ে। সেদিন একমুহূর্ত্তের জন্য ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি বাড়ীর বৌ, আমার মনে হয়েছিল—আমি যদি পুরুষ হতাম তবে—থাক, সে আক্ষেপ ক'রে আজ কোন লাভ নেই—তবু আজ সেই সব কথা মনে প'ড়ে কেবলি চোখে জল আসে—কেবলি মনে হয় যদি এমন না হয়ে অমন হ'ত তবু তো একটা সান্ত্বনা পাওয়া যেত।

বাড়ীতে ক্ষেমীর ভাব ছিল দাসদাসীদের সঙ্গে। গুরুজনেরা বলতেন—যেমন স্বভাব তেমনি সঙ্গী। আর ভাব ছিল আমার সঙ্গে। আমার বিয়ের কথা মনে পড়ে। বিয়ের আনন্দ কোলাহল ও বাড়ীর জনতা কমে এল। যাঁরা বিয়ে দেখতে এসে অসুখে পড়েছিলেন তাঁরা আরাম হয়ে দেশে ফিরে গেলেন—

আমার শাশুড়ীর মাস্‌তুত বোনের মেয়ে নিস্তারিণী ঠাকুরঝির সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছিল—তাঁর একটি ছেলে হয়ে আঁতুরেই মারা গেল—এমনি ক'রে যখন সকল হাঙ্গাম চুকল, ছুটীর শেষে স্বামী কল্‌কাতার মেসে ফিরে গেলেন এবং আমার কাজকর্ম্ম শিক্ষার সময় এল, তখন ভাসুর দেওর যা' ও নানারকম ননদে ঠাসা বাড়ীটাতে এক একদিন হাঁপিয়ে উঠতাম। কার সঙ্গে কথা বলতে হবে, কার সামনেই বা বের হওয়া নিষেধ, বৌ মানুষের দ্রুত চলা উচিত কিনা, হাসা উচিত কি না, পিতার অভাবে মাতার অত্যধিক আদরে আমার চরিত্রে কি কি দোষ ঘটেছে—এসব কথা শুনতে শুনতে এক-একদিন মন একেবারে উদ্ধত হয়ে উঠত। বাস্তবিকই মিত্তিরদের বাড়ীর বৌ হবার যোগ্যতা আমার ছিলনা। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে চেষ্টার ক্রটী হয়নি। মিত্তিরদের সরিক-বাড়ীর একটী নতুন বৌ গান গাইতে জানত ব'লে শাশুড়ী আমার স্বামীর জন্যে গান-জানা মেয়ে খুঁজেছিলেন। আমি একটু আধটু গান গাইতে পারতাম—আমার পুরোনো হার্ম্মোনিয়ামটা আমার সঙ্গে এসেছিল—কিন্তু গান গাওয়া দূরে থাকুক, হার্ম্মোনিয়াম বাজান আমার পক্ষে নিষেধ ছিল। একদিন ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে হার্ম্মোনিয়ামটা আস্তে আস্তে একটু বাজিয়েছিলাম। তারপর দিন থেকে হার্ম্মোনিয়ামের চাবি শাশুড়ী নিজের কাছে রেখে দিলেন। স্বামীর কাছে ঘন ঘন পত্র লেখা নিষেধ, মায়ের কাছে পোষ্টকার্ড ভিন্ন লেখা নিষেধ ;—এ সবই হয়েছিল এবং ফল

যে কিছুই হয়নি একথা বলতে পারি না। শাসন বল, উপদেশ বল, শিক্ষা বল, প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি, কিন্তু স্বামী ছাড়া আর কারো কাছে না পেয়েছি ক্ষমা, না পেয়েছি একটু আদর ; অথচ বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ীর অপরিচিত লোকের মধ্যে একটুখানি আদর পাবার জন্যে মনটা উন্মুখ হয়ে থাকত। মনটা যখন বেশী উগ্র হয়ে উঠত—কিছুতেই বিরক্তি দূর করতে পারতাম না—তখন পিসিমার কথা ভাবতাম—তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলা নিষেধ ছিল। আমিও তাঁকে এড়িয়েই চলতাম, তাঁর কাছে গেলে তিনি ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, পাছে আমরা তাঁর কোন জিনিষ পত্তর ছুঁয়ে দি—কারণ, তিনি জানতেন যে একান্ত বিশুদ্ধতার জন্যে দিনের মধ্যে যতবার স্নান করা, অন্তত কাপড় ছাড়া অবশ্য কর্ত্তব্য, আমার ততবার হয়ে উঠত না ; কিন্তু পরে দেখেছি পিসিমা এসব প্রশ্ন একেবারেই তুলতেন না। পিসিমা একদিন হঠাৎ আমার স্বামীর নাম করে বললেন, বৌ, তাকে আমি নিজ হাতে মানুষ করেছি। তুমি আমার সঙ্গে কথা বোলো—আমায় দেখে অত লজ্জা করবার দরকার নেই—আমি আবার একটা মানুষ! সেইদিন বুঝলাম পিসিমা কত বড় একটা ব্যথা নীরবে বহন করছেন। যখনই ছোটখাটো অত্যাচারে অধীর হয়ে পড়তাম তখনই তাঁর কাছে গিয়ে বসতাম। দুপুরবেলা বাইরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে, কার্ণিশের উপর থেকে পায়রার ডাক শোনা যাচ্ছে। পিসিমা ভোগের দালানে সমস্ত দরজা জানালা

বন্ধ ক'রে দিয়ে মেজেতে আঁচল বিছিয়ে শুতেন। আমি একখানা খবরের কাগজের উপর সুপুরি কেটে জমা করতাম। পিসিমা হেসে বলতেন, পাগলী, আমরা যে মেয়ে মানুষ—আমাদের কি সহ্য না ক'রে উপায় আছে? ঐ ত—ঐ কথাটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না। মেয়ে মানুষ হয়েছি বলেই কি ন্যায় হোক অন্যায় হোক সব মাথা পেতে নিতে হবে? পিসিমা বলতেন—পূর্ব্বজন্মে পাপ না করলে স্ত্রীজন্ম হয়না। আবার এক একদিন পিসিমা তাঁর শ্বশুর বাড়ীর গল্প করতেন—তাঁদের টিনের ঘর, তাঁদের মস্ত পুকুর, পিসেমশায় ঘন দুধ খেতে ভালবাসতেন, একবার তিনি বাজী রেখে একটা কাঁঠাল একাই খেয়েছিলেন,—এই সব বলতে বলতে পিসিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একটু চুপ করতেন, তারপর দেখতাম তাঁর হাতের হাতপাখাখানা টলে মেজেতে পড়ে যেত, তাঁর নাক একটু একটু ডাকতে সুরু করত। আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে দোতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতাম। মনে হ'ত সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে গ্রামটা যেন মূর্চ্ছিতের মত পড়ে রয়েছে—দূরে গ্রামের পথ দিয়ে ক্বচিৎ একটি দুটি লোক অবেলায় স্নান সেরে ভিজে গামছা মাথায় দিয়ে চলেছে, অন্দরের পুকুরে সবুজ সর-পড়া জল একেবারে স্থির, পুকুরের ধারে একটা নারিকেল গাছের উপরে একটা শঙ্খচিল মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে উঠছে। রান্না ঘরের উঠানে এঁটো বাসনের সামনে দু'তিনটে কুকুর ভাত খেতে খেতে মাঝে মাঝে পরস্পরকে তাড়া করছে।

কাছে পাঁচিলের উপর এক সার কাক ব'সে আছে—মাঝে মাঝে এক একটা কাক এসে এঁটো ভাত নিয়ে উড়ে পালাচ্ছে। তারপর দেখতাম ক্ষেমী বাগানে গাছতলায় কি কুড়চ্ছে। আমিও নেমে বাগানে যেতাম। সেখানে গাছের ছায়ায় ব'সে ক্ষেমীর সঞ্চিত মুন দিয়ে কাঁচা আম খেতে খেতে খবর পেতাম—দত্তদের বাড়ী তাদের নতুন গরুর একটা বাছুর হয়েছে, বাগ্‌দীরা একটা মস্ত শুয়োর মেরেছে—আরও কত কি? আমি বলতাম—তুই যে অমন ক'রে যেখানে সেখানে যাস, একদিন বাগদীরা তোকে ধরে নিয়ে যাবে। ক্ষেমী বলত, ইস!

এক একদিন উত্তেজিত হয়ে স্বামীকে বলতাম। স্বামী বলতেন—তুমি ওসব গোলমালের মধ্যে যেওনা। জানতাম স্বামীকে ব'লে লাভ নেই। তিনি কলেজে পড়েন, কোন অত্যাচার দমন করা তাঁর সাধ্য ছিল না এবং অত্যাচার নিবারণ করবার চেষ্টা করলে অত্যাচার কমা দূরে থাক বাড়বারই সম্ভাবনা ছিল। এক-এক সময়ে ভাবি, যদি স্বামী আমার পক্ষ অবলম্বন ক'রে কিছু বলতেন, তবে না জানি মিত্তির পরিবারে কি বিপ্লবই উপস্থিত হ'ত। অপরিচিত নয়, অন্য নয়, নিজের স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করা—মিত্তির পরিবারে যা কখনও হয়নি আজ নাকি তাই হ'ল—এমন মেয়েও ঘরে এনেছিলাম!—এমন ধরণের কথা নিশ্চয়ই উঠত। গল্পে শুনেছি কিছুদিন পূর্ব্বে এই মিত্তির বাড়ীতেই কার যেন ছেলের কলেরা হয়েছিল। কিন্তু ছেলের

বাপ তো নিজে ছেলের চিকিৎসা করাতে পারেন না—বিশেষত নিজের বাপ বর্ত্তমানে, অথবা সে কথা নির্লজ্জের মত তাঁকে বলতেও পারেন না। এই সব গোলে ডাক্তার যখন এল তখন ডাক্তার না আনলেও ক্ষতি ছিল না। আমার শ্বশুর ছিলেন বাড়ীর কর্ত্তা। দুবেলা খাওয়া ও রাত্রে শোওয়া ছাড়া বাড়ীর ভিতরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। জমীদারী দেখা ও পূজা-আচ্চা নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। তিনি অত্যন্ত মনভোলা বেখেয়ালী মানুষ ছিলেন। কিন্তু বাড়ীর যিনি কর্ত্তা তিনি বেখেয়ালী হ'লে চলে না। এই যে পিসিমার প্রতি নানাবিধ অত্যাচার উপেক্ষা হ'ত, সে সবের প্রতিকার করা কি তাঁর উচিত ছিল না? যারা ছোট—কর্ত্তব্য কর্ম্মে ভুল হওয়ামাত্র যারা শাস্তি পেত—তাদের কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য ঢের লোক ছিল, কিন্তু যাঁরা কর্ত্তব্য পালন না করলে সংসারে শত অশান্তির সৃষ্টি হ'ত তাঁরা কর্ত্তব্য স্মরণ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করতেন। পিসিমার কথাই ভাবি। তাঁর যখন বিয়ে হয়েছিল তখন ছেলে দেখবার আবশ্যকতা কেউ বোধ করেনি। যাঁর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল তাঁর আর্থিক সচ্ছলতা না থাক বংশের উচ্চতা ছিল। বাড়ীর পুরোনো চাকর মাধু ছেলে দেখতে গিয়েছিল। সে বললে এমন ছেলে হয়না, যেন সাক্ষাৎ কার্ত্তিক, তাদের তিন-চারিখানা টিনের ঘর, পুকুরে মাছ, দেশে দুধ ঘি সস্তা। বিয়ের পর দেখা গেল টিনের ঘর ঋণের দায়ে বাঁধা; মাছ দুধ সস্তা,

কিন্তু তা কেনবার কড়ি ছিল না। পিসেমশায় পিসিমার চেয়ে বছর কুড়ি বড় ছিলেন। অবশ্য তাতে কোন আপত্তি হবার কারণ ছিল না। বিয়ের কিছুদিন পরেই তাঁরা এসে আমার শ্বশুরের আশ্রয়ে এই বাড়ীতেই বাস করতে লাগলেন। ভায়ের অন্নে প্রতিপালিত হ'তে পিসিমার লজ্জা হ'ত এবং মাঝে মাঝে তিনি শ্বশুর-বাড়ী যাবার প্রস্তাব করতেন, কিন্তু এখানকার দুধ তামাক কাঁঠাল প্রভৃতি ছেড়ে যেতে পিসেমশায় কোন মতেই রাজী ছিলেন না। বস্তুত খাওয়া ও দেবদ্বিজে ভক্তি ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাঁর বিশেষ সুনাম ছিল না। চার পাঁচটি ছেলেপিলে হয়েছিল, কিন্তু একটিও বাঁচল না—এক ক্ষেমী ছাড়া। তারপর পিসেমশায়ের মৃত্যু হ'ল। ক্ষেমীকে কোলে নিয়ে পিসিমা যখন বিধবা হলেন তখন তাঁর বয়স ত্রিশের নীচে। তারপর থেকে কত অপমান আর ক্ষুদ্র অবহেলার মধ্য দিয়ে ক্ষেমীকে মানুষ করেছিলেন। বিধবা হয়ে পরের বাড়ীতে থাকতে যে কি অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার দরকার হয় তা পিসিমাকে দেখলে বোঝা যেত, কিন্তু পিসিমা এ সবকে নিতান্ত সাধারণ ভাবেই নিতেন, বলতেন অদৃষ্ট। যেন শেষ মীমাংসা হয়ে গেল—অদৃষ্ট যখন, তখন আর কি, দাঁতে দাঁত চেপে নীরবে সহ্য কর।

ক্ষেমীর সঙ্গে ভাব হ'তে আমার বেশী সময় লাগেনি। ঠাকুরঝিরা আমার চিঠি খুলে আমার নামে নালিশ ক'রে অস্থির করে তুলত। পরীক্ষার বছর স্বামীর কাছে চিঠি লেখা নিষেধ

ছিল। হয়ত দরজা বন্ধ ক'রে গোপনে তাঁর কাছে চিঠি লিখছি, ফস্ ক'রে খড়খড়ি খুলে ঠাকুরঝি বললে—ফের বৌদি, মেজদার কাছে চিঠি লেখা হচ্ছে বুঝি? মাকে বলে দেবো কিন্তু। নানা রকম ঘুস দিয়েও তাদের মুখ বন্ধ করতে পারতাম না। চিঠি ডাকে দেবার, টিকিট কেনবার পক্ষে ক্ষেমীই ছিল আমার সহায়। দুপুর বেলা হয়ত বাক্স খুলে এটা ওটা গোছাচ্ছি, ক্ষেমী পেছন থেকে হঠাৎ ঝুপ ক'রে আমার পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল—আঃ ক্ষেমী, লাগে, ছাড়়। সে ছেড়ে দিয়ে স্থির হয়ে বাক্সর কাছে বসল, তারপর ফের এটা ওটা টেনে বের ক'রে অস্থির ক'রে তুলল। আমি বলতাম—যা, আমি তোর সঙ্গে কথা বলব না। অমনি সে অনুতপ্ত হয়ে উঠত। আমার সঙ্গে এই ছিল তার ব্যবহার; মাঝে মাঝে তার চুল বেঁধে কপালে টিপ পরিয়ে দিতাম, তার মলিন কাপড়ে একটু এসেন্স মাখিয়ে দিতাম। এই নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত উভয়েই গঞ্জনা পেতাম। প্রথমত ক্ষেমীকে চোর সাব্যস্ত করা হ'ত; তারপর আমি যখন বলতাম যে আমি দিয়েছি, তখন শাশুড়ী বলতেন—নিজের ননদের সঙ্গে ঝগড়া আর পরের সঙ্গে ভাব!

ক্রমে ক্ষেমীর বয়স বাড়ল। তার বিদ্রোহের ভাব কখন যে অলক্ষ্যে দূর হয়ে গেল তা বোঝাই গেল না। আর সে পাড়া বেড়াতে যায়না। মাঠের ধারের জামগাছ আর রায়েদের ফুলগাছের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘুচে গেল। তার মুখে কোমলতা

আর চোখে লজ্জার আভাষ দেখা গেল। কুশ্রী ক্ষেমীকে সহসা সুশ্রী বলেই মনে হ'ত। তার বয়স চোদ্দ হ'ল, অথচ বিয়ের খোঁজ নেই—এ অবস্থায় পিসিমার গলা দিয়ে কি ক'রে যে ভাত গলে তা গ্রামের লোকেরা বুঝতেই পারত না। বাড়ীর সমস্ত গিন্নি বৌরাও বিরক্তি বোধ করতে লাগলেন। শাশুড়ী একদিন খাবার সময়ে আমার ভাসুরকে বললেন—আচ্ছা উপেন, ঐ যে যতু দত্ত আমাদের কি কাজ করে, তার একটি ছেলে আছে, তার সঙ্গে ক্ষেমীর সম্বন্ধ হয়না? ভাসুর তুধটুকু নিঃশেষ ক'রে বললেন—রাম রাম, সে ছোঁড়া আট টাকা মাইনেতে মুহুরিগিরি করছে। তার উপর গাঁজাটা-আশটাও চলে। তার সঙ্গে কি ক্ষেমীর বিয়ে হয়! শাশুড়ী বললেন—তা তোরা একটা উপায় করে দিস। বিয়ে হ'লে ক্ষেমীকে, ক্ষেমীর স্বামীকে তোরা তো ফেলে দিতে পারবি নে। পিসিমার আপত্তিতে কথাটা কিন্তু বেশী দূর এগোতে পারল না। আর যদি কখনও বিয়ের কথা উঠত শাশুড়ী বলতেন—আমি তার কিছু জানিনা বাপু, যাঁর মেয়ে তাকে জিজ্ঞেস কর। অবশেষে রাজপুর থেকে সম্বন্ধ এল। রাজপুর আমাদের গাঁ থেকে মাইল পোনেরো দূরে। তাঁরা মেয়ে দেখা নিয়ে বেশী গোল করলেন না, তবে হাজার তুই টাকা চাইলেন। শেষটা পোনেরো শ' টাকায় কথা পাকা হ'ল। ইতিপূর্ব্বেই আমার স্বামী ডেপুটি হয়েছিলেন এবং আমিও পূর্ব্বের মত কনে-বউটি ছিলাম না। অতএব একরকম করে

টাকাটা উঠল। বিয়ে হয়ে গেল। জামাই দেখে পিসিমা খুসী হ'লেন। জামাইটির বয়স অল্প, বি-এ পড়ছে, দেখতেও ভাল, বেশ নম্র শান্ত। শুনেছিলাম—অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, একেবারে কিছু নেই বললেই হয়। তা হোক, জামাই দেখে ভাবলাম অভাগী ক্ষেমীর এবার বুঝি কপাল ফিরল। জামায়ের নাম দীনেশ। খবর পেলাম—সে যে কেবল নিঃস্ব তা নয়, তার বাপ মা ভাই বোন আপনার বলতে কেউ ছিল না। রাজপুরে রামনিধিবাবু পাটের ব্যবসা ক'রে অনেক টাকা উপার্জ্জন করতেন, তাঁরাই দীনেশকে মানুষ করেছিলেন। রামনিধিবাবুর ছেলেরা কলকাতায় কলেজে পড়ত, দীনেশও সেইখানে থাকত, রামনিধিবাবু ও তাঁর সমস্ত পরিবার রাজপুরে থাকতেন। ক্ষেমীকে তাঁরা সেইখানে নিয়ে গেলেন। এক কাঙালের ভার আর এক কাঙালের উপর পড়ল—এই ভেবে বিয়ের সময়েই মনটা একটু খারাপ হয়েছিল; তবু এই আশা করেছিলাম যে ক্ষেমী অনেক কষ্ট পেয়েছে, ভগবান তাকে আর কষ্ট দেবেন না। বিয়ের কিছুদিন পরে সে যখন শ্বশুর-বাড়ী থেকে কিছুদিনের জন্যে ফিরে এল তখন তার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখলাম। অনেক ফর্সা হয়েছে, শরীরটাও আগের চেয়ে অনেক ভাল। সিঁথির সিঁদুরে কাপড়-চোপড়ে তাকে বেশ দেখাচ্ছিল। স্বামীর প্রেম তার সমস্ত দেহে যেন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছিল। সেই দুষ্টু পাগলী মেয়েকে একেবারে অপূর্ব্ব-লক্ষ্মী-শ্রী-মণ্ডিত ব'লে মনে হচ্ছিল। সে আর

সেই দুর্দ্দান্ত ক্ষেমী নয়, সে স্বামীর প্রণয়িনী, গৃহের গৃহলক্ষ্মী। রাজপুর থেকে সে যেদিন এল তার পর দিনই তার কাছে একখানা চিঠি এল। রঙীন খামের উপর লেখা—শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবী। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কি লো ক্ষেমী, আবার জ্যোৎস্না হলি কবে? সে জবাব দিলনা, মুখ নীচু ক'রে একটু একটু হাসতে লাগল। আজও যেন ছবির মতন সেই সব দিনকার ঘটনা আমার চোখের সামনে ভাসছে। এতটুকু বয়েস:থেকে যাকে দেখলাম সেই মেয়ে বড় হয়ে একদিন ঘরের কল্যাণী গৃহিণী হ'ল, আজ সে নাই একথা হঠাৎ কেমন অসম্ভব ব'লে মনে হয়। হ্যাঁ—তারপর বছরখানেক তার সঙ্গে দেখা হয়নি, কারণ আমি স্বামীর সঙ্গে বাংলা দেশের জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, সেও আর শ্বশুর বাড়ী থেকে ফিরে আসে নি। তবে মাঝে মাঝে তার চিঠি পেতাম। এইরকম চারপাঁচ মাস চলল—তারপর চিঠিও বন্ধ হ'ল।

ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি স্বামীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে ছুটি নিয়ে দেশে ফিরে যাওয়া হ'ল। পিসিমার কাছে শুনলাম তিনিও অনেক দিন হ'ল ক্ষেমীর চিঠি পান নি। রামনিধিবাবুর স্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে কোন জবাব পেলাম না। এমন সময়ে দীনেশের এক চিঠি পেলাম, তাতে লেখা ছিল—ক্ষেমীর খুব অসুখ এবং চিঠির ভাবে বুঝলাম সেখানে চিকিৎসা যত্ন কিছুই হচ্ছে না। দীনেশের ইচ্ছা আমরা তাকে নিয়ে আসি। লোক

পাঠালাম তাকে আনতে—তাঁরা বললেন এমন বিশেষ কিছু নয়, ঠাণ্ডা লেগে একটু কাশি হয়েছে। কিন্তু ছাড়লাম না। শাশুড়ী একটু আপত্তি করেছিলেন। বললেন—তাঁদের বৌ, তাঁরা যদি উচিত বিবেচনা না করেন।—শ্বশুরকে বললাম—তিনি নিষেধও করলেন না, উৎসাহও দিলেন না। স্বামীর ডেপুটিত্বে পরিবারের মধ্যে আমার প্রতিপত্তি কিছু বেশী ছিল—সেই জোরে নিজেই যোগাড় ক'রে তাকে আনালাম। পালকী এসে যখন অন্দরের উঠানে নামল—দেখলাম ক্ষেমীর ওঠবার সামর্থ্য নেই। পাংশু শীর্ণ মুখের মধ্যে কেবল চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। ডাক্তার বললে—যক্ষ্মা। মনে জানতাম বাঁচবেনা—তবু—হায়রে, মানুষের মনের এই তবু! সংসারের শত উপেক্ষার মধ্যে যে মানুষ হয়েছিল, আজ যেমনি সে জীবনোৎসবের দ্বারে এসে দাঁড়াল অমনি কি মৃত্যু তাকে স্মরণ করল! রোগের যে ইতিহাস পাওয়া গেল সে হচ্ছে এই—রামনিধিবাবুর একটি মেয়ে কিছুদিন হ'ল ঐ রোগে মারা যায়, তার অসুখের সময়ে ডাক্তারে রোগীর পরিচর্য্যা সম্বন্ধে শুশ্রূষাকারীদের বিশেষ সাবধান ক'রে দিয়েছিল। অতএব রামনিধি বাবুর স্ত্রী ক্ষেমীকে দিয়ে তার শুশ্রূষা করিয়েছিলেন। যদি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হ'ত তবে হয়ত এমন সর্ব্বনাশ হ'ত না। আবার ভাবি, অদৃষ্ট—বারেবারেই সেই অদৃষ্ট। একদিন যেমন মানুষের আচরণ বুঝতাম না ব'লে অদৃষ্ট ব'লে চুপ করে থাকতাম—আজও তেমনি

চুপ ক'রে রইলাম। শুনতে পেলাম ক্ষেমী সাবধান হবার চেষ্টা করলে রামনিধিবাবুর স্ত্রী বিরক্ত হতেন। দীনেশ জানত—কিন্তু সে যে তাঁদের খেয়েই মানুষ।

ক্ষেমী আমাদের এখানে এসে মাসখানেক ছিল। ডাক্তারী কব্‌রেজী মুষ্টিযোগ—কিছুতেই কিছু হ'ল না। অনেক রাতে সমস্ত বাড়ী নিদ্রায় মগ্ন—ঘরের সমস্ত জানলা খোলা—ক্ষেমী বিছানায় বিলীন হয়ে থাকত। মাঝে মাঝে একটু কাশি, তাও আস্তে। ঘরের নিস্তব্ধতা ঘড়িটার শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। বারান্দায় লণ্ঠনটা জ্বলছিল। আমি একটু একটু বাতাস দিচ্ছিলাম। পিসিমা মেঝেতে শুয়ে ছিলেন, হঠাৎ ধড়মড় ক'রে উঠে বললেন—কি? কি বৌ, কি? আমি বললাম—কই পিসিমা, কিছু নয়ত। আপনি ঘুমোন, আমি আছি। সে রাত্রে তার বুকের ব্যথাটা একটু বেড়েছিল।

ক্ষেমী বললে—বৌদি···

কি ক্ষেমী?

আমি বাঁচবনা, না?

আমি বললাম—কে বললে তুমি বাঁচবে না? তুমি ভাল হবে, একটু দেরী হবে।

না বৌদি, আমি বুঝতে পারছি আমি বাঁচব না।

আমি বললাম—লক্ষ্মীটি, একটু ঘুমোও।

ঘুম যে পাচ্ছেনা, বৌদি।

একটু চেষ্টা ক'রে দেখ।

সে বললে—না, ঘুম পাচ্ছে না। তার চেয়ে তুমি একটু কথা বল। দেখ বৌদি, এই রাত্তিরগুলো যেন যেতেই চায়না। রাত্তির আমার ভাল লাগেনা। কী চুপচাপ, একটা শব্দ পর্য্যন্ত নেই।

চুলগুলো কাটতে দেয়নি ব'লে বেণী বেঁধে দিয়েছিলাম। মনে হ'ত সে যেন সেই ছোট্ট মেয়েটি রয়েছে, আমার উপর তেমনি নির্ভর, আমার কথার উপর তেমনি বিশ্বাস। জীবনের শেষ কয়েকটা দিন বুদ্ধিহীনা ক্ষেমীর বুদ্ধি যেন অকস্মাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। প্রায়ই সে মৃত্যুর কথা বলত। মৃত্যুকে যে সে ভয় করত এমন মনে হয়না, তবে মাঝে মাঝে দেখেছি চোখের পাতা জলে ভিজে। জিজ্ঞেস করলে কিছু বলত না, চিরকালই তার ঐ রকম চাপা স্বভাব। মনে হত—ও-পারের সে এত কাছাকাছি পৌঁচেছে যে সেখানকার অনেক রহস্য সে যেন বুঝতে পারত। এক দিন সে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা বৌদি, মরলে কি লোকে পৃথিবীর কথা ভুলে যায়? আমি কি বলব, আমি সামান্য মেয়ে মানুষ, আমি সে সব কথার কি জানি! একদিন রাত্রে সে বেশী অস্থির হয়ে পড়ল। পিসিমাকে বলল,—মা, আমায় একটু কোলে নে। পিসিমা দুই হাতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। স্বামীকে ডেকে নিয়ে এলাম। ক্ষেমী বললে—মেজদা, আমি আর বাঁচব না, সবাইকে ডাক, একবার

সবাইকে দেখি। স্বামী বললেন—ক্ষেমী, একটু স্থির হয়ে শোওতো। সে বিছানায় স্থির হয়ে শুল। বললে—মেজদা, ভয় করছে। স্বামী কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন—ভয় কি? এই ত আমি আছি। আমি তোর কাছে বসছি, নে, তুই আমার হাত ধরে থাক। সে ছোট মেয়েটির মত তাঁর হাত ধরে কোলের কাছে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি আর ঘরে থাকতে পারলাম না। বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালাম। আকাশের দিকে তাকালাম, চাঁদ তখন অস্ত গিয়েছে, পাথরের মত কঠিন কালো আকাশে তারাগুলো জ্বল জ্বল করছিল। বাইরে বাগানের গাছগুলো স্তব্ধ কালো। ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ, অন্ধকারে সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটা কেমন যেন রহস্যপূর্ণ। তারি মাঝখানে ক্ষেমী—আমাদের সেই ছোট্ট ক্ষেমী—এ কোন্ অন্ধকারের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। আমি যেন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম—আকাশে, গাছগুলোয়, এই বাড়ীটার মধ্যে কি যেন ইঙ্গিত খেলে গেল। তারা যেন এই ঘরটার পানে চেয়ে কিসের প্রতীক্ষা করছে। কেবল মানুষের সেদিকে খেয়াল নেই। তারা খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিচ্ছে। একবার মনে হল চেঁচিয়ে সবাইকে ডাকি—ওগো তোমরা ওঠ ওঠ, একটা প্রাণ শেষ হয়ে যাচ্ছে।

যেদিন তার মৃত্যু হ'ল, সেদিন সকাল বেলা সে ভালই ছিল। আমায় ডেকে বললে—বৌদি, তাকে একটা টেলিগ্রাম কর।

দীনেশ তার আগের দিনই ফিরে গেছল। তার কলেজ খোলা, তাই তাকে আর টেলিগ্রাম করা হ'ল না। চিঠি লিখে দেওয়া হ'ল। সেদিন দুপুর বেলা সে একটু ঘুমোল। বাইরে বারান্দায় রোদের তাপ নিবারণ করবার জন্যে চিক ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আমি কাছে বসে ছিলাম। তার ঘুমের মধ্যে যে নিশ্বাস প্রশ্বাসটুকু চলত সে এত আস্তে যে মনে হ'ত এই বুঝি বন্ধ হয়ে গেল।

একটা মাছি উড়ে উড়ে ক্রমাগত তার মুখে চোখে বসছিল, আমি আঁচল দিয়ে সেটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম। বাড়ীর পুরুষেরা জুতো খুলে পা টিপে টিপে এসে এক একবার দেখে যাচ্ছিলেন। বাইরে বাড়ীর কোলাহল যথাসম্ভব সংযত রাখা হয়েছিল, তবু মাঝে মাঝে শুনতে পেলাম—বামন-ঠাকুর, খোকা-বাবুকে আর একটু ঝোল দাও, কর্ত্তার ভাত ফুটছে নাকি? ভাসুর তাদের শাসন ক'রে গেলেন—আস্তে, আস্তে, চেঁচিওনা। বাইরে জীবনের স্রোত তেমনি চলছিল!

সেই দিনই বিকেলে তার মৃত্যু হ'ল। তাকে নিয়ে গেল রাঙা শাড়ী পরিয়ে, কপালে সিঁদুর দিয়ে। পিসিমা উঠানের উপর উপুড় হয়ে পড়ে চীৎকার ক'রে কাঁদতে লাগলেন। আমরা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার বৃথা চেষ্টা করলাম না। দুই হাতে কান বন্ধ ক'রে বসে ছিলাম। তবু শুনতে পেলাম দূরে বহুদূরে হরিবোল হরিবোল। ঝি-চাকরেরা বড় যায়ের তত্ত্বাবধানে

গোবর জল ছিটিয়ে ঘর-বারান্দা ধুয়ে বাড়ী থেকে মৃত্যুর অশুচি স্পর্শ দূর ক'রে দিচ্ছিল। সন্ধ্যা হয়ে এল। তার শূন্য ঘরের দরজা জানালাগুলো খোলা পড়ে রইল। সে রাত্তিরটা আমার বেশ মনে আছে—ফুটফুটে জ্যোৎস্না, বসন্তের বাতাস মাঝে মাঝে উদ্বেলিত হয়ে উঠছিল। চৈত্র সংক্রান্তি তখন আসন্ন। বহুদূরে একটা ঢাক বাজছিল, বাগানের কোন গাছে একটা কুক পাখী ক্রমাগত ডাকছিল। শাশুড়ী বললেন—রামা, পাখীটাকে তাড়িয়ে দে ত! পিসিমার কান্নাও কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে এসেছিল। খোলা বারান্দায় ব'সে ব'সে হঠাৎ আমার স্বামীর জন্যে কি একটা আশঙ্কায় মনটা হু হু করে উঠল, চাকরকে ডেকে বললাম—একবার তাঁকে এখানে শুনে যেতে বলগে।

পরদিন সকাল থেকে মিত্তির-বাড়ীর প্রকাণ্ড রথ আবার সেই বাঁধা রাস্তায় মন্থরগতিতে চলল। আবার সেই সকালে উঠে দুপুরের খাওয়ার আয়োজন—বিকেলে রাত্তিরের খাওয়ার ব্যবস্থা। সেই কারো জন্যে আতপ চাল, কারো জন্যে মোটা চাল। কেবল ভোগের দালানের কঠিন ভিজে মেঝের উপর পড়ে পিসিমার চোখের জলের আর শেষ ছিলনা। ক্ষেমীর কথা যে আর উঠত না, তা নয়—সবাই বলত—সিঁথির সিঁদুর নিয়ে গেল, এমন ভাগ্যি কি সকলের হয়!

হেঁয়ালি

অনুপমদের গ্রাম হইতে কলিকাতা যাইতে হইলে পদ্মা পার হইয়া মহিমগঞ্জে গিয়া ট্রেন ধরিতে হয়। মহিমগঞ্জে পৌঁছাইতে প্রায় আট দশ ঘণ্টা লাগে। ষ্টিমার দুপুর বেলা তাহাদের গ্রামের ঘাট হইতে ছাড়িয়া রাত দশটায় মহিমগঞ্জে পৌঁছায়।

অনুপম বহুকাল পরে ছুটিতে বাড়ী গিয়াছিল। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই তাহার প্রথম দেশে যাওয়া। কিন্তু বেশী দিন সেখানে টিঁকিতে পারিল না। তাই ছুটি শেষ হইবার পূর্ব্বেই কলিকাতা ফিরিতেছিল।

কার্ত্তিকের মাঝামাঝি। রৌদ্রের উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও যেন শীতের আভাস দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। নদীতে জল কমিয়া চর উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। জল মাপিয়া মাপিয়া সাবধানে চলিতে চলিতে বৈকাল বেলা ষ্টিমারটা বালুচরে ঠেকিয়া গেল। খালাসীরা অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটাছুটি করিয়া ষ্টিমার নামাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু কোন ফল হইল না।

অনুপম ক্যাবিনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল যখন ডেকের উপর আসিল তখন খালাসীদের চীৎকার, যাত্রীদের উত্তেজনা, ষ্টিমারের ঘন ঘন ঘণ্টা ও বংশীধ্বনি অনেকটা থামিয়া গিয়াছে। প্যাসেঞ্জাররা নিরুপায় হইয়া ষ্টিমারেই রাত্রিবাস করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। অনুপম পাইপটা ধরাইয়া ডেকের উপর পায়চারী করিতে লাগিল। দূর গ্রাম হইতে একখানা নৌকা কলা ও মুড়ি বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল এবং একটা জেলেডিঙি

খালাসীদের নিকট মাছ বেচিতে আসিয়াছিল। মূল্য লইয়া তাহাদের তর্ক কিছুতেই মিটিতেছিল না। অনুপম মাঝে মাঝে রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া অন্যমনস্কভাবে তাহাই দেখিতেছিল। ফার্ষ্ট ক্লাসে সে একা যাত্রী। বেলা পড়িয়া গেলে রাত্রের খাবারের জন্য বাট্‌লারকে আদেশ দিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল।

স্নান শেষ করিয়া সে যখন বাহিরে আসিল তখন দিগন্তে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। হেমন্তের কোমল আকাশ তাহার রঙ্গে রঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। নদীর নিস্তরঙ্গ জলে তাহার ছায়া পড়িয়াছে। অনুপম ইজিচেয়ারের হাতলে দুই-পা তুলিয়া দিয়া সেই নিঃশব্দ জলস্রোত, কাশপুষ্পশোভিত বালুচর, সূর্য্যাস্তরঞ্জিত উদাস আকাশের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল।

হাইকোর্ট খুলিবার দেরি ছিল। তাই পথে বিঘ্ন ঘটাতে সে যে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু তাহার মনটা ভাল ছিল না। দেশে যাইবার তাহার কোনই প্রয়োজন ছিল না। সংসারে সে ও তার মা। ছুটিতে সেই মাকে ছাড়িয়া দেশের বাড়ীতে কেন যে গিয়াছিল আজ তাহা সেও বলিতে পারিত না। যখন যায় তখন মনের কোণে এই আশা হয়ত তাহার ছিল যে যাহাকে তিন বৎসর দেখে নাই তাহাকে একবার দেখিয়া আসিবে। কিন্তু সে সম্ভাবনা যে কত সুদূর তাহাও যে সে না জানিত—তা নয়। একটা উড়ো খবর সে

পাইয়াছিল বটে। কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করিয়া দেশে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই। সেই কবে—কাশীতে তাহার সঙ্গে শেষ দেখা। সেই হইতে অনেক দিন তাহার কোন খবরই সে পায় নাই। আর খবর পাইয়াই বা তাহার লাভ কি? সমস্ত মনপ্রাণের বিনিময়ে সে কতটুকুই-বা পাইয়াছিল? গ্রামে যে-কয়দিন ছিল—সেই বড় দীঘি, ফুলঝরা বকুল গাছের তলা, বুড়ো বট গাছের ছায়ায় পুরোনো কালী মন্দির, নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে মন্দিরের কার্ণিশে পায়রার অবিরাম শ্রান্ত কূজন—ইহাদের সঙ্গে সে নূতন করিয়া পরিচয় করিয়া আসিয়াছে—যেন নূতন করিয়া তাহার সুমধুর স্পর্শ পাইয়াছে।

কৃপণ যেমন করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজের সঞ্চিত মণিমাণিক্য নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে, অনুপম তেমনি করিয়া যেটুকু পাইয়াছিল তাহাই স্মরণ করিতে লাগিল। হিসাব করিয়া দেখিতে গেলে সে কিছুই নয়—হয়ত বা তাহার মূল্য আরও কম। তবু সেই সন্ধ্যাকালে একাকী অনুপম এই অনুভূতির দ্বারা আবিষ্ট হইয়া পড়িল।

তিন বৎসর পূর্ব্বে পূজার ছুটিতে কাশীতে তাহার সহিত সাক্ষাতের কথা মনে পড়িল। মাত্র দশটি দিন। তাও প্রত্যহ যাইতে তাহার লজ্জা বোধ হইত। তবু শরতের সেই সোনালী-নীল দশটি দিন যেন সুধায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। বিকালে—কোনো দিন বা দুপুরে—তাহাদের বাড়ী যাইত। ফিরিতে রাত্রি

হইয়া যাইত। কী-ই বা কথা! বিলেতের গল্প, ছেলেবেলাকার ভুলে যাওয়া ঘটনা, কাশীতে বেড়াইবার প্ল্যান ইত্যাদি। মনের নিভৃতে যে কথা অনুক্ষণ গুঞ্জন করিত—তাহা তো মুখে আনিবার নয়। তবু মনের মধ্যে কী তৃপ্তি লইয়াই যে সে ফিরিত! গল্প করিতে করিতে দেখিতে পাইত জানালার বাইরে নিম গাছটার পাতাগুলি থাকিয়া থাকিয়া বাতাসে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। গাছের নীচে প্রকাণ্ড বাঁধান ইন্দারা হইতে সারাদিন জলতোলা চলিতেছে। তার ওধারে মাটির দেয়ালে ঘেরা কিসের যেন ক্ষেত। রাত্রে কখনও বা নির্জ্জন রাস্তা দিয়া অন্যমনস্কভাবে অনেকটা ঘুরিয়া—কখনও বা এক্কা করিয়া বাড়ী ফিরিত। কখনও বা অনেক রাত পর্য্যন্ত একাকী দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া থাকিত। সেই দ্বিপ্রহরের নিভৃত হাসি কৌতুক আলাপ, শুভ্রমেঘখচিত নীলাকাশ, বায়ুকম্পিত নিমগাছের চিক্কণ পত্রসম্ভার, রাত্রির জনবিরল রাস্তা, এক্কার ঘোড়ার গলার ঘুঙুরের ঝুনঝুনি, ফেরিওয়ালার 'পয়েসে মে চার' তিলের চাকতি হাঁকিয়া যাওয়া—আজ সে সব স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। হায়রে, আজ সমস্ত জীবন দিলেও তাহার একটি দিন ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গা, আকাশপটে বেণীমাধবের ধ্বজাশোভিত অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের বারাণসী এই নশ্বর পৃথিবীর এক মানবীর স্মৃতিস্পর্শে সেই দিন হইতে অনুপমের কাছে স্বর্গ হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক রাত্রে যেদিন সে কাশী ছাড়িল—

গঙ্গার পুল হইতে ট্রেণের জানালা দিয়া নিদ্রিত কাশীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ভাবিয়াছিল—যাহার জন্য এত বেদনা এত ব্যাকুলতা আজ রাত্রে নিদ্রার অবকাশে, সে কি একবারও তাহার কথা স্মরণ করিবে ?

মনে পড়িল—ছোট্ট মেয়েটি—তার পেঁয়াজ রংয়ের শাড়ী পরা, হাতে নতুন প্যাটার্ণের চুড়ি, বেণী দোলাইয়া বিকেল বেলা বকুল তলায় মালা গাঁথিতে যায়। মালা লইয়া তাহার সঙ্গে ঝগড়া আবার শান্তি স্থাপন। মায়ের ভাঁড়ার থেকে অনুপমের ভাজা মসলা সংগ্রহ। দীঘির ঘাটে স্নান। কালী মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া গল্প বলা। চুপি চুপি পিছন হইতে আসিয়া চোখ টিপিয়া ধরা।

মনে পড়িল বিলেত যাত্রার দিন অনেক চেষ্টা করিয়াও অনুপম তাহার দেখা পায় নাই। বিলেতের পথে সেই দুঃখ তাহার মনকে নিরন্তর পীড়িত করিয়াছে। যাহা হউক সেই যে পরশমণির একটু ছোঁয়া লাগিয়াছিল তাহারই ফলে বিলেতের দীর্ঘ প্রবাসে তাহার মনে আর কোনও দাগ পড়িতে পারে নাই। একবার চকিতের মধ্যে কেম্ব্রিজে নদীতে উইলো গাছের ছায়ায় ডিঙ্গিতে অর্দ্ধশয়ান রঙ্গীন ছাতার নীচে ভায়োলেট আণ্ডারউডের ছবি মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু মন তাহাতে সায় দিল না। হয়ত ক্ষণিকের জন্য একটু মোহ হইয়াছিল—কিন্তু এ ত মোহ নয়। প্যারিসে—ইভেট্ ? মন বলিল—পাগল! কার সঙ্গে

কার তুলনা? এ যে 'হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির'—তাইত মন আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না। সেই মুক্তা-ধূসর আকাশে দুইটি সুন্দর দীর্ঘ ভ্রু ও দুইটি কালো চক্ষুর স্নিগ্ধ শান্ত দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। সে দৃষ্টি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল—মমতায় কোমল। তাহার মন এক অনির্ব্বচনীয় অসহ্য মধুর বেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠিল। পুরাতন ক্ষতের মত এই বেদনা। ইহা লইয়া কত পুষ্পগন্ধঘন নক্ষত্রখচিত নিদ্রাহীন রাত্রি, নির্জ্জন সন্ধ্যা, কত মেঘাচ্ছন্ন বৃষ্টিমুখর বর্ষার দিন সে কাটাইয়াছে তাহার ঠিক নাই। কত রাত্রে তাহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছে এবং সেই স্বপ্নের স্পর্শ সমস্ত দিনটাকে মধুময় করিয়া দিয়াছে। আর আজ সে কতদূরে চলিয়া গিয়াছে—তাহা কে জানে? কিন্তু সে আর কতদিন এই বেদনার বোঝা বহিয়া বেড়াইবে? মনে মনে কহিল—'এইবার আমায় ছুটি দাও—রেহাই দাও—আমাকে বাঁচিতে দাও।' কোন এক বিদেশী কবির কবিতা মনে পড়িয়া গেল,—

"Goddess the laughter-loving, Aphrodite,
befriend!
Long have I served thine altars, serve me
now at the end,
Let me have peace of thee, truce of thee,
golden one, send.

"Heart of my heart have I offered thee,
pain of my pain,
Yielding my life for the love of thee
into thy chain ;
Lady and goddess be merciful, loose me
again.

*　　*　　*　　*

"Blossom and bloom hast thou taken,
now render to me
Ashes of life that remain to me, few
though they be,
Truce of the love of thee, Cyprian, let
me go free."

কিন্তু বেদনার এই বন্ধন থেকে সত্যই কি সে মুক্তি চায় ?

আশৈশব পরিচয় সত্ত্বেও দুই চারিটি ঘটনার স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নাই। শৈশবে গ্রামে একত্র খেলাধূলা, কলিকাতায় কলেজে পড়িবার সময়ে হোষ্টেল হইতে বালীগঞ্জে গিয়া তাদের বাড়ীর ছাদে বৈকালিক সভা ও চা পান—টুকরা টুকরা কথা—অকারণ চোখে চোখে দৃষ্টি বিনিময়, স্নিগ্ধ কোমল সলজ্জ হাসি—চলিয়া আসিবার কালে চাদর টানিয়া ধরিয়া রাখা—আর কাশীর সেই দশটি দিন। এই-ই সব ! তবু এই সম্বলের উপর নির্ভর করিয়া মায়ের অনুরোধ ও চোখের জল অগ্রাহ্য করিয়া সে এ পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই। অথচ মায়ের সে এক ছেলে। তার

ভাল অবস্থা, সুশ্রী চেহারা, কেম্ব্রিজের ডিগ্রী, ইঙ্গবঙ্গ সমাজে সমাদর—সবই ছিল। পশারও একটু একটু করিয়া জমিয়া উঠিতেছিল। কেবল সকল সম্পদের মধ্যে তার উদাসীন খামখেয়ালী ভাব যেন বাড়িয়াই চলিয়াছিল। সেকথা মনে করিলেই মায়ের চোখে জল আসিত।

পিতার অসুখের সংবাদ পাইয়া বিলাত হইতে মাঝখানে সে একবার আসিয়াছিল। পিতা তখন অনেকটা সুস্থ। তাহাদের বাড়ী দেখা করিতে গিয়াছিল। একদিন যে ছিল তার খেলার সাথী, সে হঠাৎ ধীর গম্ভীর লাজুক। কথা জিজ্ঞাসা করিলে মাথা নাড়িয়া জবাব দেয় মাত্র। অনুপমও যেন পূর্ব্বের মত সহজ ভাবে কথা বলিতে পারিল না। কেবল একবার সকলের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে অনুপম হঠাৎ লক্ষ্য করিল যে সে তার আশ্চর্য্য দুই চক্ষু মেলিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। চোখে চোখ পড়াতে চক্ষু নামাইয়া লইল। অনুপমের বুকের মধ্যে রক্ত যেন তোলপাড় করিতে লাগিল। তার নিজের কথার সূত্র হারাইয়া গেল। সেই গোপন দৃষ্টির হয়ত কিছু অর্থ ছিল—হয়ত বা কিছুই ছিল না। তবু আজ সেই দৃষ্টির স্মৃতি তাহার মনে অপূর্ব্ব পুলক সঞ্চার করিল।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। একটা বড় বিদেশী নৌকা গুণ টানিয়া চলিতেছিল। গুণ গুটাইয়া তাহারা রাত্রির মত চরের মাথায় নৌকা বাঁধিল। তাহাদের নৌকার ভিতর বোধ করি

রান্নার আয়োজন হইতেছিল। তাহার আলো ক্ষণে ক্ষণে চরের মাথার খানিকটা অংশ আলোকিত করিতেছিল। বাঁ দিকে তীরে বহুদূর বিস্তৃত মাঠের মাঝখানে বাবলাগাছ কয়েকটা ক্রমশঃই অস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। ময়ূরকণ্ঠী আকাশে একটি একটি করিয়া তারা ফুটিয়া উঠিল। দূরে গ্রামের খেয়াঘাটে কোন বিলম্বিত যাত্রী পার হইবার জন্য খেয়ামাঝিকে বুঝি ডাকিতেছিল। তাহার আহ্বানের প্রতিধ্বনি আকাশে মিলাইয়া গেল। কি বিষণ্ণ শান্ত স্নিগ্ধ সন্ধ্যা।

অনুপম কোন রকমে রাত্রির আহার শেষ করিয়া আবার চেয়ারে শুইয়া পড়িল। ডেকে একটি মাত্র আলো জ্বলিতেছিল—বাট্‌লারকে বলিয়া তাহাও নিবাইয়া দিল।

অকস্মাৎ শুনিল—কেমন দিদি, যা বলেছিলাম ঠিক নয়? অনুদা'ইত। অনুদা, সন্ধ্যাবেলায়ই অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে আছ যে? ঘুমোচ্ছিলে নাকি? সন্ধ্যাবেলায়ই ঘুম! এইবার দিদি—বাজি হেরেছ ত?"

অনুপম ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল। কিছুক্ষণ যেন ঠাহর করিতে পারিল না। হঠাৎ মেয়েছেলে দেখিয়া অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল—"সবিতা তুই!—তোরা কোত্থেকে—কি আশ্চর্য্য—তোরা ষ্টিমারে উঠলি কখন?"

অনুপম তাড়াতাড়ি দুই তিনটা চেয়ার টানিয়া আনিল। বলিল—"বোসো, বোসো—বোস্ সবিতা—বোসো সুচরিতা!"

সবিতা কহিল—"না না—তুমি ইজিচেয়ারে বোসো। দিদিকে আবার স্থচরিতা কেন? ওকেতো রাণী বল্‌তে।"

অনুপম কহিল—"ঠিক ঠিক—তা তোকে ত ছুট্‌কি বলতাম—তা সে নাম তো আর এখন চলবে না। তাই ভয়ে ভয়ে স্থচরিতা বলেছি, আর একটু হলেই রাণী ব'লে ফেলেছিলাম। সামলে নিলাম—যদি রাগ করে। আচ্ছা—বোসো রাণু।"

সবিতা কহিল—"আমি কখন থেকে বলছি যে অনুদা'কে দেখেছি। দিদি বললে—যা যা, তুই ত ঐ রকমই দেখিস। ধাক্কা লাগবার একটু পরেই যেন তোমাকে দেখলাম। তারপর ফের বাথ্‌রুম থেকে বেরোবার সময়ে দেখলাম। তবু পিছনটা দেখেছি কিনা। সেকেণ্ড ক্লাসের মেয়েদের ক্যাবিন থেকে দেখা যায়।"

রাণী জিজ্ঞাসা করিল—"ধাক্কা লাগবার সময়ে তোমাকে দেখলাম না কেন অনুদা?"

অনুপম কহিল—"আমি বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।" দুই বোন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

সবিতা কহিল—"ধন্যি ঘুম যাহোক। এদিকে ষ্টিমার ডোবে—আর তুমি ঘুমোচ্ছ।"

অনুপম কহিল—"আরে পাগলী—ষ্টিমার কি এত সহজে ডোবে! একটু চরায় ঠেকেছে তা কী হয়েছে?"

সবিতা কহিল—"ডোবে না আবার। এত বড় নদীতে আবার ষ্টিমার ডোবে না—কী যে বলো তার ঠিক নেই।"

অনুপম কহিল—"আচ্ছা—আপাততঃ যখন ডোব্‌বার কোনই সম্ভাবনা নেই তখন সে সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে লাভ কি? আর যদি ডোব্‌বার সম্ভাবনা দেখো তবে একটু আগে থেকেই আমাকে খবর দিও। আমি নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েও তোমাকে রক্ষা করব। ব্যস্‌—হোলো তো।"

সবিতা কহিল—"অনুদা আলোটা জ্বালাওনি কেন? অন্ধকার ভাল লাগছে না।"

বাট্‌লার কফি লইয়া আসিল। অনুপম তাহাকে আলোটা জ্বালাইতে বলিল। ডেকের আলোটার জোর কম তবু চকিতের মধ্যে সে একবার রাণীকে দেখিয়া লইল। বলিল—"কফি খাবে, না—চা?" সবিতা লেমোনেড খাইতে চাহিল। কফি তেতো লাগে। রাণী কিছুই খাইতে চাহিল না। তাহার কিছুরই প্রয়োজন নাই। শেষে পীড়াপীড়িতে লেমোনেড্‌ খাইতে রাজী হইল।

রাণী জিজ্ঞাসা করিল—"রাত্রে খাবে কি? কফিতেই পেট ভরবে নাকি?"

অনুপম কহিল—"কেন—এখানেই ডিনার খেলাম যে!"

সবিতা কহিল—"মাগো—কী সাহেবিয়ানাই যে করো। ওদের হাতে খেতে ঘেন্না করে না?—ওরা যা নোঙরা!"

অনুপম কহিল—"তা ছাড়া খাবার পাবো কোথা? কিন্তু তোমরা কি খাবে—খাবার টাবার কিছু আনাবো?"

রাণী কহিল—"আমরা কি খাবার না নিয়ে বেরিয়েছি নাকি, তুমি চলো না কিছু খাবে, আর মার সঙ্গেও দেখা করবে। চলো, মাকে প্রণাম করে আসবে।"

অনুপম ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "চলো—মাকে প্রণাম করে আসি—কত দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি।"

অনুপম রাণীর মাকে প্রণাম করিয়া আসিল। কিছু না খাইয়া পারিল না। খাইতেই হইল। তারপর তিন জনে আবার ফার্ষ্টক্লাস ডেকের উপর গিয়া বসিল। রাণীর মা ক্যাবিনে শুইয়া রহিলেন। ষ্টিমারে উঠিলেই তাঁর গা বমি বমি করে। ডেকে ফিরিবার সময় পথে অনুপম তামাকের চামড়ার থোলেটা ভরিয়া লইতে ক্যাবিনে ঢুকিল। সবিতা কহিল—"দেখি অনুদা' তোমার ক্যাবিন কি রকম।" ক্যাবিনে ঢুকিয়া জিনিষপত্র এটা ওটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, নানা ভঙ্গীতে আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখিয়া লইল এবং অনুপমের চিরুণীটা দিয়া নিজের চুলটা একটু ঠিক করিয়া লইল। রাণী বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। কহিল—"আঃ কি আরম্ভ করেছিস, সবিতা। চিরুণীটায় তেল লাগাচ্ছিস কেন?"

সবিতা কহিল—"কেন—এতেই চিরুণীটা খারাপ হয়ে গেল না কি?"

রাণী কহিল—"ওটা কি..."

সবিতা কহিল—"নাই বা হোলো আমার। অনুদা'ত আমাদের পর নয়।"

অনুপম বাধা দিয়া কহিল—"না না সবিতা, তুই মাথায় দে না। রাণুর কথা ছেড়ে দে। ও লোককে কেবল পর মনে করে।"

ডেকের উপর চেয়ারে বসিয়া সবিতা কহিল—"অনুদা, তুমি বাড়ি গেলে আর আমাদের সঙ্গে দেখা করলে না যে বড়! বড় মানুষ হয়েছ বলে, না সাহেব হয়েছ বলে ?"

অনুপম বলিল—"আমি কি জানি যে তোরা বাড়ী আছিস। জানলে কি আর না যাই। রমেশবাবুর সঙ্গে দেখা হোলো—তিনিও তো কিছু বললেন না, তা ছাড়া গেলে যদি চিনতেই না পারতিস ?"

"আহা হা—আমরা তোমায় চিনতে পারবো না! নিজে হয়েছ সাহেব—এখন দোষ ত আমাদেরই।"

রাণী প্রশ্ন করিল—"বাড়ী কেমন লাগলো ?"

অনুপম কহিল—"খুব ভালো লাগল। নদীর ধার, বকুলতলা, কালী মন্দির—আমি তো কেবল ঘুরেই বেড়িয়েছি। মনে হোতো সেই ছেলেবেলার দিনগুলো যদি ফিরে পাওয়া সম্ভব হোতো···। কিন্তু মাঝে মাঝে বড় একলা মনে হোতো। তাই তো ফিরলাম।"

রাণী কহিল—"জানো অনুদা, সেই কামরাঙ্গা গাছটা নেই।"

অনুপম বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"কোন্ কামরাঙ্গা গাছটা—?"

রাণী কহিল—"বাঃ এরই মধ্যে ভুলে গেছ! সেই যে কামরাঙ্গা

পাড়তে গিয়ে প'ড়ে গিয়েছিলে। পূজোর মধ্যে দিন পোনেরো শুয়ে ছিলে। হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আমাদের বাড়ী যাত্রা গান শুনতে আসতে। মনে নেই ?"

অনুপম বলিল—"কি আশ্চর্য্য! তোমার সে-সব কথা মনে আছে রাণু? আমি ভেবেছি তুমি ভুলেই গেছ—কিছুই তোমার মনে নেই।"

রাণী কহিল—"কালীকে মনে আছে—কালিদাসী ?"

সবিতা বিরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল—"কি সব পুরোণো কথা যে তোমরা আরম্ভ করলে। আমার ভাল লাগছে না বাপু। কি যেন তোমাকে জিজ্ঞেস করব মনে করছিলাম তা তোমাদের কথায় ভুলেই গেলাম। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আচ্ছা অনুদা— তুমি মা'র কথার উত্তর দিলে না কেন বলো তো ?"

"কোন্ কথার উত্তর দিলাম না ?"

—"মা যে জিজ্ঞেস করল—তুমি বিয়ে করছ না কেন—সে কথার তো কিছু বললে না।"

—"বোলবো আবার কি ? যথাসময়ে বিয়ে কোরবো এবং তোমাদেরও নিমন্ত্রণ থেকে বঞ্চিত কোরবো না—অতএব ধৈর্য্য ধারণ কর।"

—"অনুদা, ওসব বক্তৃতা কোরো যারা তোমায় চেনে না— তাদের কাছে। প্রায় চার বছর হোলো এসেছ। তুমি বিয়ে করছ না বলে সেদিন তোমার মা কত দুঃখ করলেন। বললেন

যে তিনি একটা জায়গায় কথা পর্য্যন্ত দিয়েছিলেন কিন্তু তুমি ছুতোনাতা করে ভেঙ্গে দিলে। এখন সত্যি করে বল দিকি মতলবটা কি তোমার।"

অনুপম কহিল—"সবিতা তুই বক্তৃতা আমার চেয়ে ঢের ভাল দিস—as a matter of fact আমি তোর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে এক্ষুণি বিয়ে করতে রাজী—সংখ্যায় বেশী হ'লেও আপত্তি করব না। তুই এখন আমার জন্যে কনে দেখ। তবে কুঁচবরণ কন্যা আর তার মেঘবরণ চুল হওয়া চাই। আর যদি কুৎসিত মেয়ে আনিস তবে একটা বাঁদরের সঙ্গে তোর বিয়ে না দিইচি তো আমার নাম অনুপম রায় নয়…"

সবিতা কহিল—"আঃ অনুদা, থামো না—আগে তোমার কথা হোক। শোনো—তুমি দিদির ননদ মিনিকে বিয়ে কর না। বেশ দেখতে—আমাদের কলেজে পড়ে। কি সুন্দর গান গায়! কি বলিস দিদি…তুইও বল না।"

রাণী এতক্ষণ কথা কহে নাই। সে বলিল—"সে ভাগ্যি কি আর তার হবে?"

অনুপম চিন্তার ভাণ করিয়া কহিল—"দেখ একটা গুরুতর কাজ অমন হঠাৎ করতে নেই—তা ছাড়া আমাকে তার পছন্দই বা হবে কেন?"

সবিতা রাগ করিল। কহিল—"দেখ অনুদা, আমাদের অত বোকা পাওনি যে কিছুই বুঝতে পারি না। নিশ্চয়ই তুমি

বিলেতে বিয়ে করে এসেছ। মাগো কি পছন্দই তোমাদের! কটা চোখ আর শণের মত চুল···।"

অনুপম কহিল—"না গো না—তারা দেখতে তোদের চেয়ে ঢের ভাল। ঐ আকাশের মত নীল তাদের চোখ—জানিস···"

সবিতা মাথা নাড়িয়া কহিল—"বুঝেছি গো বুঝেছি, আর বলতে হবে না। ধরা পড়ে গেছ।"

অনুপম কহিল—"না না, যা ভাবছিস তা নয়···বিয়ে করিনি।"

সবিতা কহিল—"বিয়ে করনি—তবে নিশ্চয়ই প্রেমে পড়েছ ···বিয়ে করবার মতলব আছে।"

রাণী কহিল—"আঃ সবিতা, কি বাজে বকছিস বলত।"

সবিতা বলিল—"একটু থাম না দিদি। সত্যি বলো না অনুদা—সত্যি কি কাউকে ভালবেসেছ?"

হাসি কৌতুক ছাড়িয়া অনুপম এক মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া গেল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে কহিল—"সবিতা তুই যা বলেছিস—তা সত্যি। একজনকে ভালবেসেছি।"

সবিতা কহিল—"কিন্তু তুমি যদি মেম বিয়ে কর—তাহ'লে তোমার মার কি হবে বলতো?"

অনুপম তেমনি গম্ভীর সুরে কহিল—"সবিতা···সেত মেম নয়—সে বাঙ্গালীর মেয়ে।"

"বাঙ্গালীর মেয়ে? অনুদা' সত্যি বলছ?"

সবিতা অনুপমের মুখের দিকে বিস্মিতদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু অনুপমের গলার স্বরে স্পষ্ট বোঝা গেল যে সে আর ঠাট্টা করিতেছে না। অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া অনুপম চুপ করিয়া পাইপ টানিতে লাগিল।

তারপর একটু হাসিয়া কহিল—"যাক্। সবিতা, পান খাওয়াতে পারিস—অন্ততঃ একটু মসলা…"

সবিতা কহিল—"সাহেব আবার পান খায় নাকি? আচ্ছা দাঁড়াও আনছি—কিন্তু কথাটা আমাদের বলবে তো?"

অনুপম কি যেন ভাবিল, তারপর কহিল—"আচ্ছা, বলব।"

—"তিন সত্যি।"

—"আচ্ছা—তিন সত্যি।"

রাণী কহিল—"এখনও তেমনি সুপুরি খাও নাকি? এতদিন বিলেতে থেকেও ছেলেবেলার বদ অভ্যাস যায়নি?"

অনুপম কহিল—"হায় হায়, লুকিয়ে ভাঁড়ার থেকে মসলা এনে খাইয়ে যে বদ অভ্যাস করালো—আজ কি-না সেই দেয় দোষ।"

রাণী ভর্ৎসনার সুরে কহিল—"বটে!—আমি ভাজা মসলা আনতে ভুলে গেলে তুমি আমার খোঁপা টেনে খুলে দিতে। তা বুঝি আজ তোমার মনে নেই? এখন দোষ দেওয়া হচ্ছে আমায়। আমি করিয়েছি বদ অভ্যাস!"

অনুপম কহিল—"বদ অভ্যাস একটি নয়—অনেক করিয়েছ।

আজ তোমার দেখা নাই, অথচ সেই অভ্যাসগুলো রয়ে গেছে—তাই বিপদে পড়ে গেছি। কি করি বলোতো ?"

অনুপমের কথার সুরে কোথায় যেন একটু বেদনা ছিল। সবিতার মনে কষ্ট হইল। সে কহিল—"বাবা, মসলা নিয়ে এত খোঁটা দিচ্ছ। আচ্ছা মশায়, এনে দিচ্ছি তোমার মসলা—কিন্তু কথা দিয়েছ—প্রতিজ্ঞা ভুলো না।"

সবিতা গুনগুন করিয়া কি একটা গান করিতে করিতে চলিয়া গেল। দুইজনে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীর মধুবর্ণের চাঁদ দূর পারের বাঁশঝাড়ের পিছনে দেখা দিয়াছে। উপরের আকাশের অন্ধকার যেন অনেকটা স্বচ্ছ হইয়া উঠিতেছে। মনে হইল সমস্ত পৃথিবীতে কোথাও কোন শব্দ নাই এবং তাহারা দুটি ভিন্ন কোথাও যেন কোন প্রাণী নাই। মনে হইল কান পাতিয়া থাকিলে নদীর সঙ্গে তটভূমির যে চাপা কথা ও হাসি চলিতেছে তাহাও বুঝি বোঝা যায়।

অনুপম কহিল—"তারপর রাণু, কেমন আছ ? শরীর ভালো তো ?"

রাণী কহিল—"এই চলছে—তোমায় কিন্তু রোগা দেখাচ্ছে।"

অনুপম কহিল—"না—রোগা কোথায় ?"

তারপর থামিয়া পুনরায় কহিল—"ভাগ্যে এই ষ্টিমারটা ঠেকেছিল।"

রাণী কহিল—"আমি জানতাম তুমি বাড়ী গেছ।"

অনুপম কহিল—"তবে খবর দাওনি কেন ?"

রাণী বলিল—"কি হোতো খবর দিয়ে···তা ছাড়া সাহস পাইনি।" বলিয়াই হাসিয়া উঠিল।

অনুপম আবার ডাকিল—"রাণী !—"

সবিতা আসিয়া কহিল—"এই নাও মশাই, তোমার পান আর এই নাও মসলা। এখন বলোতো আমরা তাকে জানি কিনা ?"

অনুপম কহিল—"দাঁড়াও—পান টান খেয়ে নি।"

সবিতা ছোঁ মারিয়া পানের ডিবেটা হাতে তুলিয়া লইল। কহিল—"ওসব হবে না অনুদা—কথা দিয়েছ।"

অনুপম বলিল—"আহা, এই তো বলছি। প্রথমতঃ কি ক'রে বলবো জানো কিনা...তোমরা কাকে কাকে জানো তাই আগে বলো !"

সবিতা কহিল—"অনুদা—পায়ে পড়ি তোমার—আর দুষ্টুমি কোরো না—বলো আমরা কি তাকে দেখেছি ?"

অনুপম বলিল—"হ্যাঁ দেখেছ।"

—তাকে কি জানি ?

—জানো।

—আচ্ছা, সে কি সুন্দরী ?

—আমার কাছে তার চেয়ে সুন্দরী নেই।

—বিলেতের মেমদের চেয়েও ?

—বলেছি ত আমার কাছে তার তুলনা নেই।

রাণী উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল—"আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। সবিতা তুই গল্প শোন্—আমি শুইগে।" কিন্তু সবিতা তাহার আঁচল টানিয়া ধরাতে তাহাকে পুনরায় বসিতে হইল এবং চরের যেখানটায় শাদা শাদা কাশফুল ও বুনো ঝাউএর উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছিল আধো-বোজা চোখে সে সেই দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

সবিতা প্রশ্ন করিল—"কত দিন তাকে জানো ?"

অনুপম কহিল—"বোধ হয় জন্ম জন্ম ধরে…"

—তাকে খুব ভালবাসো, অনুদা ?

—সে কথা মুখে বলবার নয়।

—তার নামটা বলবে ?

—সেটি জিজ্ঞাসা কোরো না ভাই—আমি বলতে পারবো না।

—সে তোমায় ভালবাসে ?

—না।

—কি ক'রে এ কথা জানলে ?

—যে ক'রে এ সব কথা জানা যায়।

—সে জানে যে তুমি তাকে ভালবাসো ?

—কি ক'রে বলব ? সম্ভব জানে না…আবার কখনো মনে হয় একি সে না বুঝে পারে ? সবিতা বল দেখি কে লিখেছে—

আমার হৃদয়ে যে-কথা লুকালো, তার আভাষণ
ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয় তলে ?

দুয়ারে এঁকেছি রক্ত রেখায় পদ্ম-আসন,

সে তোমারে কিছু বলে ?

—না না অনুদা, কবিতা শুনতে চাই না। কিন্তু এ কথা তুমি তাকে জানাও নাই ?

—না।

—কেন ?

—পাগল—এ কথা কি তাকে বলা যায় !

—তাকেই বিয়ে কর না কেন অনুদা···তোমার মা বুঝি আপত্তি করেন ?

—না না—কেউ একথা জানে না···আর সে হ'তেই পারে না।

—কেন ? তারা কি ভিন্ন জাত···আর হ'লই বা—তুমি ত ও সব মানো না।

—তারা ভিন্ন জাত নয়···কিন্তু তা হ'তে পারে না।

—তবে ?

—তবে—শুনে কাজ নেই। বাধে, তা না হ'লে হয়ত চেষ্টা করতাম।

—বিলেত থেকে এসে তার সঙ্গে দেখা কর নি ?

—একবার দেখা হয়েছে।

—কি বললে—বলো না।

—বিশেষ কিছুই নয়।

—অনুদা, যাই বলো। তার উপর আমার খুব রাগ হচ্ছে।

লক্ষ্মী ভাই, নামটা বলই না। কাউকে বলব না। আমরা না হয় একটু চেষ্টা ক'রে দেখতাম। দিদি, তুই বুঝতে পারছিস কার কথা বলছে অনুদা?

রাণী মাথা নাড়িয়া জানাইল সে বুঝিতে পারে নাই।

কহিল—"অনুদা কত লেখাপড়া জানা মেয়ে—বিলেত ফের্ত্তাদের মেয়েকে জানে—তাদের সবাইকে আমরা কি জানি যে আমরা বুঝতে পারবো।"

সবিতা বলিল—"অনুদা যে বললে আমরা তাকে জানি—দেখেছি—। আচ্ছা অনুদা, কোথায় তাকে শেষ দেখেছ?"

অনুপম কহিল—"কাশীতে"।

সবিতা প্রশ্ন করিল—"কাশীতে? কত দিন আগে?"

অনুপম বলিল—"বছর তিনেক হ'ল। গেল পূজোর আগের পূজোয়।"

সবিতা কহিল—"কাশীতে তখন ত আমরাও ছিলাম! ও হরি, ...তাই বলো—এইবার বুঝেছি...মাধুরী...উপেনবাবুর বোন তো? কাশীতে যাদের বাড়ীতে ছিলে গো। যাদের সঙ্গে আজ রামনগর কাল সারনাথ যাওয়া হ'ত..."

অনুপম কহিল—"আহা বেচারী...এর ভেতর মাধুরীকে টানা কেন?"

সবিতা বলিল—"না-না বেশ হয়—না দিদি? মাধুরীকে দেখতে মন্দ কি...তবে যতটা বলছ ততটা নয়।...তাই তুমি

আমাদের ওখানে রইলে না। দিদি বললে—আমি বললাম—মা কত সাধ্য সাধনা করলে কিন্তু তুমি গিয়ে উপেনবাবুদের ওখানে রইলে। বললে, তারা রাগ করবে—যেন আমাদের রাগেরই কোন মূল্য নেই। এইবার বুঝলাম গো বুঝলাম।…"

সবিতার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া অনুপম কহিল—"সবিতা—মিছে বকছিস—সে মাধুরী নয়।"

সবিতা এইবার হাল ছাড়িয়া দিল। বলিল—"তবে জানি না বাপু কে—আমি আর ভাবতে পারি না। দিদি…ও দিদি ঘুমিয়ে পড়লি না কি?

রাণী কহিল—"না ঘুমোইনি তো শুনছি। তুই গল্প শুনতে চেয়েছিলি—গল্প শুনলি। এতে এতো ব্যস্ত হবার কি আছে? তুইও যেমন—সব কথাই বিশ্বাস করিস।"

সবিতা কহিল—"তুমি কি বানিয়ে বলছিলে অনুদা?"

অনুপম বলিল—"না ভাই, এতো বানানো নয়—সত্যিই বলছিলাম। আর বলছিলাম তোমাকে—রাণুকে তো বলছিলাম না। ওর কাছে তো আমি কোনদিন কোনো প্রশ্রয় পাই নি।"

সবিতা কহিল—"আহা, বেচারা অনুদা…তোমার জন্যে সত্যি আমার কষ্ট হচ্ছে। বলই না বিয়ের বাধাটা কি? তুমি যাকে বাধা ভাবছ সে হয়ত বাধাই নয়!"

অনুপম কহিল—"বাধা ভাই, অনেক—তবে প্রথম বাধা তার বিয়ে হয়ে গেছে।"

সবিতা ভর্ৎসনার স্বরে কহিল—"ছিঃ অনুদা—এ ভালো নয়।"

অনুপম কহিল—"কি করব বোন—যখন এই কাহিনীর আরম্ভ তখন আমরা দু'জনেই ছেলেমানুষ। এক সঙ্গে খেলেছি, বেড়িয়েছি, মালা গেঁথেছি—ভালো মন্দ তখন তো বুঝি নি। তারপর যেদিন এই পৃথিবীকে সত্যি সত্যি চোখ মেলে দেখলাম—তাকেও দেখলাম। মনে হ'ল পুরোণো এই পৃথিবী কি সুন্দর—তার মাঝখানে সে—সে অপরূপ। তারপর যখন বুঝলাম এই ভালবাসা—তখন আর মনকে ফেরাবার সাধ্য আমার ছিল না। তবে এতে তার পাপ বা অনিষ্ট হবার কিছু নাই। কারণ সে তো এর কিছু জানে না। যদি ক্ষতি বা পাপ হয়ে থাকে তো আমারই হয়েছে। কিন্তু তাও আমি স্বীকার করি না। তা ছাড়া আমিও একেবারে বঞ্চিত হই নি। অনিচ্ছায়, অজ্ঞাতসারে সেও আমাকে অনেক দিয়েছে। বাস্তবিকই আমার কোন দুঃখ নেই। আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। অনুপমের আবেগ সবিতাকে বিচলিত করিল। সে কহিল—"অনুদা, এমন ক'রে কতদিন থাকবে?"

অনুপম কহিল—"এমন ক'রে থাকা কি আমার ইচ্ছা দিদি—দেখা যাক কি হয়। হয়ত বিয়ে করব—সংসারীও হ'ব। কিন্তু আজ নয়। তাড়া কি? সে সব তো আছেই! তখন হয়ত এই কথা মনে ক'রে তোরাই হাসবি। বলবি—

অনুদা কি গল্পটাই করেছিল। কিন্তু তবু বলে রাখি—আজ যা বললাম—তাই সত্যি, পরে হয়ত যা দেখবি—সে ঘোর মিথ্যা। কিন্তু এখন এ প্রসঙ্গ বন্ধ কর। যে কথা কেউ জানে না—কাউকে কখনও বলব ভাবি নি—আজ হঠাৎ সেই কথা তোমাদের বলে ফেললাম। আমি বুঝছি—সে বলা অন্যায় হ'ল। ক্ষমা কোরো এবং গল্পটাও ভুলে যেও।"

সবিতার যেমন একটুকুতে হাসি ফাটিয়া পড়িত তেমনি একটুকুতেই চোখে জল আসিত। তার চোখ ছল ছল করিতে লাগিল। দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অনুপম হাসিয়া কহিল—"সবিতা, কি হাবা মেয়ে তুই। তেমনি ছোটই আছিস—মিছে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছিস। সত্যি কি গল্প কিছুই বুঝতে পারিস না। অমনি অমনি চোখে জল আনলি!"

সবিতা বিস্মিত হইয়া অনুপমের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কহিল—"অনুদা—বানিয়ে বলছিলে? আমি ভেবেছি সত্যি বলছ···কি জানি আমি তোমাদের বুঝতে পারি না।"

রাত্রি অনেক হইয়াছে। সবিতা কহিল—"দিদি চল্ যাই···মা হয়ত কি ভাবছে। আমারও ঘুম পাচ্ছে। কখন যে ষ্টিমার ছাড়বে—কবে যে কলকাতায় পৌঁছব—তাও তো বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু অনুদা তোমার এতটা বানিয়ে বলা উচিত হয় নি। ঐ জন্যেই দিদি তোমার কথায় বিশ্বাস করে

না। কি হেঁয়ালি বললে, আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল···
কি জানি কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যা।"

অনুপম কহিল—"আশা করি কালও ষ্টিমার চলবে না···"

সবিতা কহিল—"বটেই ত—আর আমরা বুঝি এখানে আট্‌কে পড়ে থাকব—আর দিদির মেদিনীপুর যাওয়া হবে না।"

রাণী উঠিবার উপক্রম করিতেই অনুপম কহিল—"আর একটু বসই না···ঘুম ত রোজই আছে।" রাণী সেই মিনতির সুরকে উপেক্ষা করিতে পারিল না। বসিয়া রহিল। বলিল—"যা সবিতা আমি একটু পরেই যাচ্ছি—তুই শোগে।"

"বেশী দেরি করিস না—আর যদি নামটা জানতে পারিস—আমায় বলিস দিদি"—বলিয়া সবিতা চলিয়া গেল।

অনুপম ও রাণী—তুইজনে বসিয়া রহিল। দূরে শুভ্র বালির চরের উপর, ঈষৎ আন্দোলিত রাশি রাশি কাশ ফুলের উপর, নদীর নিঃশব্দ জলস্রোতের উপর, ঘুমন্ত বিদেশী নৌকাটার উপর অজস্র জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িতেছিল। খানিকটা জ্যোৎস্না ডেকের উপর রাণীর শাড়ির এক প্রান্ত ও পায়ের স্যাণ্ডেলে রূপালি বাঁধনটার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। বুনো ঝাউএর মধ্যে রাত্রির হাওয়ার ক্ষণে ক্ষণে চলাচলের শব্দ ভিন্ন যতদূর দৃষ্টি যায় সমস্ত জগত নিস্তব্ধ। ষ্টিমারের মাথার উপর দিয়া নিঃশব্দে গোটা কয়েক হাঁস বোধ হয়, উড়িয়া আকাশে মিলাইয়া গেল। তাহারি একটা কে জানে কেন অকস্মাৎ

ডাকিয়া উঠিল। সেই আহ্বান শুধু মুহূর্ত্তের জন্য রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আবার নিস্তব্ধতায় বিলীন হইয়া গেল।

অনুপম কহিল—"ও হাঁস···শীতকালে আসে···"

রাণী কহিল—"কিছু কি বল্‌বে···"

অনুপম কহিল—"কি বলবো—বলো···"

—তবে যাই ?

—যাবে ?—আচ্ছা—যাও।

রাণী উঠিল না।

অনুপম কহিল—"একটা কথা বলব···কিন্তু বড় ভয় পাই··· যদি অপরাধ হয়—"

রাণী কহিল—"এমন কি কথা···"

অনুপম কহিল—"একখানা ফটো দেবে ?"

রাণী বলিল—"কার—আমার ? আমার ফটো নিয়ে তুমি কি করবে ?"

অনুপম—"ফটো নিয়ে আর মানুষ কি করে···রেখে দেবো।"

রাণী—"কিন্তু আমার ত কোনো ফটো নেই···"

অনুপম কহিল—"আমি তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে তোমার একটা প্লেট্ সংগ্রহ করেছি—যদি নিষেধ না করো তো ছাপিয়ে নেবো।"

রাণী কহিল—"না।"

অনুপম কহিল—"নেবো না ?"

রাণী কহিল—"না।"

অনুপম কহিল—"প্লেটটাও কি ফিরিয়ে দিতে হবে?"

রাণী হাসিয়া কহিল—"শুধু প্লেট দিয়ে তুমি কি করবে—তার চেয়ে ওটা বিনয়কে ফিরিয়ে দিও"

চুপ করিয়া থাকিয়া অনুপম কহিল—"তাই হবে।"

অনুপম কহিল—"আর একটি কথা,...বিলেত যাওয়ার আগে যে কবিতাগুলো লিখেছিলাম—সেগুলো বিশেষ কিছু হয় নি—তবু সেগুলো একত্র ক'রে বই ছাপাচ্ছি। যদি সেটা তোমার উৎ..."

রাণী বাধা দিয়া কহিল—"তুমি কি পাগল হয়েছ?"

অনুপম কহিল—"বেশ, তোমার কথা কখনও অমান্য করিনি, আজও করব না। শুধু আর একটি...না না প্রশ্ন করব মাত্র। যে বইটা পাঠিয়েছিলাম—সেটাও ফিরিয়ে দিলে কেন? তোমার জন্যই বাঁধিয়ে এনেছিলাম..."

রাণী হাসিয়া কহিল—"ওঃ রবিবাবুর "উৎসর্গ"? সে ত আমি নিজেই কিনে নিতে পারি!"

অনুপম বলিল—"ঠিক—আমার সেটা মনে ছিল না...রাণু, সব বিষয়েই মৃত্যুদণ্ড দিলে—"

এইবার রাণী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"ছিঃ ও কথা বলতে নেই। অনেক রাত হয়েছে। আমার একটা কথা রাখবে? একটি সুন্দরী মেয়ে নিজে দেখে বিয়ে কোরো।

বৌএর সঙ্গে আমার ভাব ক'রে দিও। ভয় নেই এ গল্পটা তাকে বলে দেবো না। এখন যাও শোও গে। এত রোগা হয়ে গেছ কেন বলত ? বিলেত গেলে না শরীর ভাল হয় ? আমি শুনেছি খাওয়া শোয়া নিয়ে ক্ষেপামি কর। ও রকম করলে কি শরীর টেঁকে ? বুঝলে ?···শুন্‌ছ ?"

অনুপম কহিল—"কি বললে—ওঃ শরীর ?"

রাণী কহিল "হ্যাঁ গো, শরীর। যতদিন বৌ না আসে ততদিন আমাদের কথা শুনেই চলো না···বুঝলে।···দিব্যি রইল।"

মুহূর্ত্তের জন্য অনুপমের মনে হইল কে যেন তাহার মাথার চুলে আলগোছে হাত বুলাইয়া দিল। কিন্তু মুখ তুলিয়া চাহিয়াই বুঝিল সেটা তাহার মনের ভুল। রাণী চলিয়া গিয়াছে।

সে যেমন ছিল তেমনি বসিয়া রহিল।

* * * *

ভোরে ষ্টিমারের বাঁশীর শব্দে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল দেখিল রাত্রে ইজিচেয়ারেই সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আসন্ন সূর্য্যোদয়ে আকাশ রঙীন—নদীর জল দো-রঙা রেশমের মতো ঝলমল করিতেছে। জেলে ডিঙ্গিতে নদী ভরিয়া গিয়াছে। শেষ রাত্রে কখন ষ্টিমার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বহুদূরে ঝিকিমিকি নদীর স্রোতের ওপারে···হালকা কুয়াশার মধ্য দিয়া অস্পষ্টভাবে লাইনের উপর দণ্ডায়মান ট্রেন, পাড়ে লাগান সারিসারি ষ্টিমার, কয়লার গাদা ও বহু নৌকার মাস্তুল···মহিমগঞ্জ দেখা যাইতেছে।

সাহিত্য সভা

একদা গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামের জমীদার চৌধুরীবাবুদের বড় তরফের একমাত্র কুলতিলক বি-এ উপাধিধারী বিপিনবিহারী যখন স্বগ্রামে একটি সাহিত্য-সভা স্থাপন করবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে আমাকে তলব করলেন, তখন সে তলব অমান্য করতে পারলাম না, কারণ বিপিন আমার সহপাঠী এবং আমি তার চিরানুগত বন্ধু। জ্যৈষ্ঠের নিঃঝুম দুপুর বেলায় সতরঞ্চ-পাতা তক্তপোষের উপর খাতাপত্র মাথায় দিয়ে হাতপাখা সঞ্চালন ক'রে ঘুমোবার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু উঠতে হ'ল এবং মনে মনে ভয় হ'তে লাগল। গ্রামে সভার নাম শুনলেই আমার আতঙ্ক হ'ত। কারণ গ্রামে কোন ক্লাব হ'লেই আমাকে তার সেক্রেটারী হতে হ'ত। তার কারণ এ নয় যে আমি অপর সকলের চেয়ে কার্য্যক্ষম ছিলাম। আসল কথা সভার প্রথম অধিবেশনে উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রকাশের বেগটা কমে গেলে সকলেই যখন উচ্চৈঃস্বরে কার্য্যভার গ্রহণে নিজেদের অনুপযুক্ততা প্রকাশ করতেন তখন আমার মৃদুকণ্ঠের আপত্তি কেহই শুনতে পেতেন না, কাজেই এই অযাচিত সম্মান আমার মাথাতেই পড়ত। তবে সুবিধা ছিল এই যে দ্বিতীয় অধিবেশনের অভাবে আমার সম্মানটা বজায় থাকত অথচ অযোগ্যতা প্রকাশ পেত না।

গিয়ে দেখি বিপিনের বসবার ঘরে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বসে আছেন; গ্রামের স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়, পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা গম্ভীরভাবে আহুত

ব্যক্তিদের আগমন প্রতীক্ষা করছেন। দেখে মনটা বিশেষ উৎফুল্ল হ'ল না। ভাবলাম এবার ফাঁকি নয়, একেবারে সত্যিকার সভা। শঙ্কিত চিত্তে চৌকীর একপাশে বসলাম। যাঁদের আসবার কথা ছিল—সেদিনটা হাট-বার থাকাতে আসতে একটু বিলম্ব হ'ল। যাহোক তাঁরা সকলে এলে হেডমাষ্টার মশায় উঠে দাঁড়ালেন। আমরাও একদিন তাঁর কাছে পড়েছি এবং এখন পর্য্যন্ত যে ভয় কাটিয়ে উঠেছি—তা বলতে পারি না। তাঁর নাম ছিল—শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তিনি তাঁর স্কন্ধদেশে লম্বমান চাদর ও শাদা কাপড়ের ঘেরাটোপ দেওয়া ছাতাটা চেয়ারের উপর সযত্নে রেখে রোষকষায়িত লোচনে ওজস্বিনী ভাষায় আমাদের সম্বোধন ক'রে সাধু ভাষায় যে বক্তৃতা দিলেন তার সারাংশ নীচে দিলাম। তিনি বললেন—"আজ আমরা যে মহৎ উদ্দেশ্যে মিলিত হইয়াছি, আশা করি আপনারা তাহা জানেন; পৃথিবাতে যতপ্রকার আনন্দ আছে—শুধু আনন্দ নয়—বিশুদ্ধ আনন্দ আছে—তাহার মধ্যে সাহিত্যপাঠ অন্যতম। এই ধরুন চাণক্য-শ্লোক—তার মধ্যে যে সকল কথা আছে—কি গভীর ভাব—অথবা ধরুন ছেলেবেলায় একখানা বই পড়েছিলাম—কি যেন তার নামটা...এখন মনে পড়েছে না—তাতে...।" চক্রবর্ত্তী মহাশয় যদিও ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পক্ষে ছিলেন না তথাপি প্রকৃত দেশহিতৈষী ছিলেন এমন কি সম্ভবতঃ একজন নীরব কর্ম্মী

ছিলেন। তাই তিনি স্বতঃই দেশের কথা ওঠালেন। তিনি বললেন যে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা অতি শোচনীয়। হুজুগ করলেই যে স্বরাজ হয় না তা তিনি বেশ জোর ক'রেই বললেন। প্রাচীন কালের সরলতা নম্রতা ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা ক'রে আধুনিক কালের ছেলেদের অশিষ্ট ব্যবহারের অতিশয় নিন্দা করলেন। পূর্ব্বে নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে উচ্চ শ্রেণীর লোকদের কিরূপ সৌহৃদ্য ছিল তার উল্লেখ ক'রে বললেন যে তাঁদের গ্রামে (হেডমাষ্টার মহাশয় ভিন্ন গ্রামের লোক) একটি কৈবর্ত্ত আছেন এবং হেডমাষ্টার মহাশয় তাঁহাকে (কৈবর্ত্তকে) দাদা বলতেন এবং সমাগত ভদ্রলোকদের মধ্যে ভট্টাচার্য্য মশায়, বাবুদের ম্যানেজার সরকার মশায় এবং আরো দুই একটি ভদ্রলোক ভিন্ন এমন কেহ নাই যাঁকে তিনি প্রাগুক্ত কৈবর্ত্ত মহাশয়ের অপেক্ষা বেশী শ্রদ্ধা করেন। দেশের দুরবস্থা থেকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ল। তিনি বললেন—"প্রকৃত শিক্ষা যে কি মূল্যবান জিনিষ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পশুপক্ষীর সহিত মানুষের যদি কোন প্রভেদ থাকে তবে তাহা এই শিক্ষার প্রভেদ।" এইরূপ দুই ঘণ্টাকালব্যাপী বক্তৃতার পর তিনি শ্রান্ত হয়ে মুখ, দাড়ী এবং গোঁফ মুছতে মুছতে বসে পড়লেন। আমরা এতক্ষণ অপরাধীর মতো চুপ ক'রে বসেছিলাম। বড় হয়ে অবধি এরূপ ভর্ৎসনা আর কখনও শুনি নি।

তারপর উঠলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তিনি বললেন যে হেডমাষ্টার মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিত ও অমায়িক ব্যক্তি অতি বিরল এমন কি দেখা যায় না বললেও অত্যুক্তি হবে না,—অতএব তাঁর সঙ্গে ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্পূর্ণ একমত এবং তিনি এই আশা করেন যে সকলেই যেন এই বক্তৃতার সারমর্ম্ম মনে রাখেন ও সেই অনুসারে চলেন। তারপর হেডমাষ্টার মশায় বাণিজ্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা ভট্টাচার্য্য মশায় সমর্থন করলেন যে আমাদের ঋষিরা বলে গেছেন যে 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি'। সে যা হোক এই সভার সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সহানুভূতি আছে। তৎপর এও বললেন যে—শ্রীমান বিপিন উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান—তার যেমন স্বভাব তেমনি শিক্ষা। তা নাই হবে কেন—যে বংশে সে জন্মগ্রহণ করেছে সে বংশের মত—ইত্যাদি। অবশেষে শ্রীমান বিপিন দীর্ঘজীবী হোক এই আশীর্ব্বাদ করে তিনি আসন গ্রহণ করলেন এবং ব্রাহ্মণের হুঁকায় তামাক ইচ্ছা করলেন।

তারপর দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় ইংরেজীতে বক্তৃতা দিলেন। আমরা তাঁর কাছেও পড়েছিলাম। লোকটি ছিলেন ইংরেজী নবীশ। কাছাকাছি দশ বিশটা গ্রাম জুড়ে তাঁর ইংরেজী দখলের খ্যাতি ছিল। সকলেই জানত যে রতনপুর থেকে ডাকঘর যে আমাদের গ্রামে উঠিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল—সে কেবল তাঁর লিখিত দরখাস্তের ইংরেজী ভাষার গুণে। আমাদের গ্রামে

যাঁরা প্রাচীন এবং যাঁরা এ সকল বিষয় জানতেন তাঁরা বলতেন যে—লোকটা গ্রামে পড়ে থাকার দরুণ ওকে কেউ চিনলে না—ক'লকাতা সহরে যেত তবে লালমোহন ঘোষ বা সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যের মত একটা কিছু হ'তে পারত। দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের নাম ছিল প্রফুল্ল বাবু। স্কুলে পড়বার সময়েই শুনেছিলাম যে প্রফুল্ল বাবু বি, এ পাশ নন বটে তবু ইংরেজীতে তাঁর অসামান্য অধিকার। যেবার তিনি বি, এ ফেল করলেন সেবার নাকি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে তৃতীয় হয়েছিলেন—গণিত বা ঐরূপ একটা নগণ্য বিষয়ে দুই নম্বর কম পড়াতে পাশ করতে পারেন নাই। তাঁর কাছেই শুনেছি যে বিলেত হ'লে এ রকম হ'তে পারত না। সেখানে যথার্থ গুণীর আদর আছে—হাজার হোক স্বাধীন দেশ তো। এই ধর না বিখ্যাত ব্যারিষ্টার টি, এন, দাস। সেও ত প্রফুল্ল বাবুর সঙ্গে ফেল ক'রে তারপর বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়ে এসে কত টাকা রোজগার করছে। দাস কিন্তু লোকটি ভাল। এখনও রাস্তাঘাটে প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে দেখা হ'লে গাড়ী থামিয়ে জিজ্ঞাস-বাদ করেন। আমাদের প্রফুল্লবাবুও কলেজ থেকে বেরিয়ে জাপান যাবার চেষ্টা করেছিলেন—সাবান বানানো শিখতে। ক'লকাতায় তখন একটা এসোসিয়েশন ছিল তাঁরা বিদেশ যাবার জন্যে বৃত্তি দিতেন। প্রফুল্লবাবুর দরখাস্তের উত্তরে তাঁরা জানিয়েছিলেন যে সে বৎসর জাপান যাবার জন্যে কোন বৃত্তি ধার্য্য নাই,

তবে প্রফুল্লবাবু যদি কৃষি-বিদ্যা বা জাহাজের ডক নির্ম্মাণ শিখতে গ্ল্যাসগো যেতে রাজী থাকেন তবে তাঁর দরখাস্ত বিবেচনা করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য প্রফুল্লবাবু রাজী ছিলেন। সে কথা এসোসিয়েশনের কর্ত্তৃপক্ষদের জানাতে তাঁরা উত্তর দিলেন—না, তাঁদের বাজেটে এবার আর কোন বৃত্তি ধরা নাই কারণ আশানুরূপ চাঁদা সংগ্রহ হয় নাই। অবস্থা ও অদৃষ্ট মন্দ থাকলে যা হয় তাই হ'ল—প্রফুল্লবাবু বিদেশ যাত্রার সংকল্প ত্যাগ করে আমাদের ইংরেজী শিক্ষার ভার নিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা প্রণালীর তিনি অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। এক এক দিন কথা উঠত কেমন ক'রে তিনি ইংরেজী শিখেছিলেন—তিনি আমাদের উপদেশ দিতেন—"দেখ, তোমরা সর্ব্বদা dictionary দেখবে—আর কতকগুলি ভাল ভাল idiom মনে রাখতে চেষ্টা করবে—আর সুবিধা পেলেই 'আউট-বুক' পড়বে।" তিনি চিরকাল মারি কোরেলি, রাইডার হ্যাগার্ড প্রভৃতি ভাল ভাল 'আউট-বুক' পড়তেন এ আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।

যাই হোক, প্রফুল্লবাবুর বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হওয়ার কথা, কারণ দুর্গাপূজার ছুটির পূর্ব্বদিনে, সরস্বতী পূজায়, অথবা কোন শিক্ষক পদত্যাগ ক'রে অন্যত্র গমন করার উপলক্ষ্যে যে সকল সভা বসত উপরোক্ত তিন জন বক্তাই বক্তৃতা করতেন আর করতেন ডাক্তারবাবু—তবে সেদিন

বোধ হয় রোগী দেখতে ভিন্ন গ্রামে গিয়েছিলেন তাই সভায় উপস্থিত হ'তে পারেন নাই। অতএব প্রফুল্লবাবুর বক্তৃতার পর সভা ভাঙ্গবার উপক্রম হয়েছে এমন সময়ে আমার পাশ থেকে একটি অপরিচিত লোক দুটি কথা বলবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁকে আমি প্রথমে লক্ষ্য করি নাই। এখন দেখলুম ভদ্রলোকটি যেমনি রোগা তেমনি বেঁটে কিন্তু তাঁর গোঁফ ও চাপদাড়ির অনাবশ্যক প্রাচুর্য্য আছে—একেবারে চোখের নীচে থেকে গলার নিম্নতম সীমা পর্য্যন্ত শ্মশ্রুতে আবৃত। গায়ে একটি তিলেপড়া সার্ট এবং হাতের বোতাম না থাকাতে সূতা দিয়ে আস্তিন সেলাই করা। লোকটির দেহের রং কালো এবং তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। তিনি হেডমাষ্টার মহাশয়ের কথার প্রতিবাদ করলেন, আধুনিককালের অনেক সুখ্যাতি করলেন এবং প্রাচীনপন্থীদের অনেক নিন্দা করলেন। সভাস্থ সকল যুবককে তাদের যৌবন সম্বন্ধে সজাগ হ'তে বললেন এবং সকল বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা করতে উৎসাহ দিলেন। আমরা এই অসম সাহসিক ব্যক্তিটির পরিচয় নিলাম—তিনি আমাদের নূতন পোষ্টমাষ্টার—নাম অঘোরবাবু। হেডমাষ্টার মহাশয় বললেন যে, যদি তাঁকে দুই মিনিট সময় দেওয়া হয় তবে তিনি পোষ্টমাষ্টারবাবুর উত্তরে দুটি কথা বলবেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি কষ্টে তাঁকে নিরস্ত করলেন—বললেন—"উনি

বিদেশী লোক এখানকার অবস্থা কি জানেন—কি-ই বা বোঝেন ? ওঁর কথা ধরতে নাই।” সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল অতএব সভা ভঙ্গ করা হ’ল। যার যার হারিকেন লণ্ঠন বেছে নিয়ে সকলে নিজ নিজ বাড়ীর দিকে রওনা হলেন এবং আমি যা ভেবেছিলাম তাই হ’ল—আমাকেই সেক্রেটারী হ’তে হ’ল।

সভার সৃষ্টি হ’ল ও সেই সঙ্গে গ্রামের সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা আগেই অনেক কথা ব’লে রাখলেন। বললেন, দেখো এ সভা টিঁকবে না,—অথবা টিঁকলেও যেরূপ হ’বার কথা সেরূপ কিছুতেই হবে না। এর আগেও তো অনেক সভা হয়েছিল কিন্তু টিঁকল কই ? এও তাই হবে ইত্যাদি। প্রথম অধিবেশনের পূর্ব্বেই সভা নিয়ে গোলযোগ উপস্থিত হ’ল—খবর পেলাম যে সকলে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন না। রামহরি চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতা ভজহরি গ্রামের ‘দি রয়্যাল থিয়েটারে’ ফ্লুট বাজাত এবং প্রয়োজন হ’লে রাণী-ও সাজত। সে আমাকে স্পষ্ট বলে গেল—এ সভায় অনেক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক আসবেন না, কারণ তাঁদের ব্রাহ্মণ দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। কাগজে ব্রাহ্মণ মহাশয়ের নাম লিখে নিম্নজাতির লোকের হাত দিয়ে নিমন্ত্রণ চিঠি পাঠান হয়েছে এবং সে চিঠিতে ‘শ্রীচরণকমলেষু’ না লিখে ‘মহাশয়’ লেখা হয়েছে। এরূপ নিমন্ত্রণ পূর্ব্বে কখনও তাঁরা গ্রহণ করেন নাই আজও করবেন না। আরও বলল যে—সে একথা বলতে কাকেও

ভয় করে না—কারণ সত্যি কথা বলতে আবার ভয় কাকে? বিশেষতঃ বড়লোক ব'লে ভয় পাওয়া—এ তার স্বভাবই নয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভাইপো গুপে, হরেকৃষ্ণ সাহার দোকানে হিসাব লিখত। সে কহিল—সে যদি এ সভায় যায়, তবে সে ব্রাহ্মণের পুত্রই নয়। কারণ যে সভায় কৈবর্ত্তের সঙ্গে তুলনা ক'রে ব্রাহ্মণের অপমান করা হয়েছে, সে সভায় যে যায় যাক—শ্রীরমণীমোহন ভট্টাচার্য্য যাবে না। পরে জানলাম রমণীমেহেন তারই নাম, গুপেটা ডাক নাম মাত্র।

এত বাধা ও বিপত্তি সত্ত্বেও সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হ'ল। লোক সংখ্যাও মন্দ হ'ল না। বাবুদের বাড়ীতে সভা, এ অবস্থায় না এলে তাঁরা কি মনে করবেন, তাই সকলেই এমন কি ভজহরি ও গুপেও এসেছিল। বৃদ্ধ বংশীবদন দাস মহাশয় অনেক বয়স হওয়াতে চোখেও ভাল দেখতেন না, কানেও ভাল শুনতেন া—এবং সেই কারণে এক হাটে ছাড়া কোথাও বড় যেতেন না। তিনিও সেদিন লাঠি ঠুক ঠুক ক'রে একটি ছোট ছেলের হাত ধরে এসে উপস্থিত হলেন। দাস মহাশয় মাঝে মাঝে—"ইনি কে?" "উনি কে?" "ওঁর বাঁয়ে বসে কে" "ওই দাড়িওয়ালা বাবুটি কে ত কখনও দেখিনি", "কর্ত্তা কৈ?" "মাষ্টার আবার কি বলে" এমন কি যে ভৃত্য তাঁকে তামাক এনে দিল তার নাম কি এবং সে নূতন বহাল হয়েছে কি না প্রভৃতি প্রশ্ন উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞেস করে সভায় বড় গোলযোগ

করছিলেন। এ বিষয়ে দ্বিতীয় অপরাধী ছিলেন বিপিনের পিতা চৌধুরী মহাশয়। তিনি পুত্রস্নেহ নিবন্ধন প্রথম থেকেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যা হলেই সভার এক পাশে ভিন্ন হয়ে বসে চোখ বুজে মালা জপ করতে লাগলেন—কখনও বা চোখ মেলে কারো কোন বিষয়ে অসুবিধা না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিলেন। জপ হয়ে যাওয়ার পরেও যখন সভার অধিবেশন চলল তখন তিনি ভৃত্যের দ্বারা গাত্রমার্জ্জনা করাতে লাগলেন এবং মাঝে মাঝে কি ভাবে মার্জ্জনা করতে হবে সে বিষয়ে ভৃত্যকে উপদেশ দিতে লাগলেন। তবে বিপিনদের খাজাঞ্চী জমানবীশ থেকে আরম্ভ করে ঠিকে মুহুরীরা পর্য্যন্ত সকলেই শেষ পর্য্যন্ত সমান অটলভাবে বসে ছিলেন—এর জন্য তাঁরা প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। প্রথমেই গান হ'ল—"কবে নেবে হে ভব কিনারে।" গানের ভাষা ও সুর হৃদয়ে গভীর নৈরাশ্য সঞ্চার করল। হেডমাষ্টার মহাশয় 'সংযম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। গ্রামের ইউনিয়ান বোর্ড ও হরিসভার সভাপতি শ্রীনিবাসবাবু কি প্রসঙ্গে যেন পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অশেষ করুণার কথা বলে অশ্রুবিসর্জ্জন করলেন। ক্রন্দন এবং গাম্ভীর্য্যে সভার আবহাওয়া থৈ থৈ করছে এমন সময় বাহিরের বারান্দায় সভাসীন ভদ্রলোক-দের যে সকল নানাবিধ পাদুকা জড় হয়েছিল তাতে হুঁচোট খেয়ে গুপে হঠাৎ সশব্দে পড়ে গেল ও আমরা সেই সুযোগে খুব খানিকটা

হেসে নিলাম। হেডমাষ্টার মহাশয় আমাদের বললেন—কেউ আছাড় খেলে হাসা অত্যন্ত গর্হিত।

পোষ্টমাষ্টার অঘোরবাবুর কথা পূর্ব্বেই বলেছি। যদিও সভার প্রথম অধিবেশনের পূর্ব্বে আমাদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই, তবু ছুটিতে বাড়ী গিয়েই তাঁর যশ আমরা শুনতে পেয়েছিলাম। লোকটি পৃথিবীর অধিকাংশ বিষয়ে মতামত স্থির করে রেখেছিলেন। মহাযুদ্ধের ফলাফল থেকে আরম্ভ করে গণতন্ত্রের তিরোভাব,—এর মধ্যে এমন কিছু ছিলনা যে বিষয়ে তিনি নিজের অভ্রান্ত মতামত খুব গম্ভীরভাবে এবং সজোরে প্রকাশ না করতেন। তাঁর এ সকল মতামত কোন প্রকার শিক্ষার প্রসাদে জন্মগ্রহণ করে নাই। তবে তিনি বাংলা দৈনিক কাগজখানা অনেকক্ষণ ধরে আদ্যোপান্ত পড়তেন। অঘোরবাবু এণ্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়েছিলেন এবং সেইখানেই শিক্ষা সমাপ্ত করে পোষ্টাফিসের চাকরী নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের মত আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর উপর তাঁরও অবজ্ঞার অন্ত ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই বলতেন—"আজকাল যারা পাশ করে তারা বিশেষ কিছু শেখে না, আমাদের সময়ে সকল বিষয়ে একটা স্বাধীন চিন্তা ছিল—আর কেবল নোট মুখস্থ করে পাশ করলেই কি জানা যায়?" পরীক্ষা পাশ সম্বন্ধে তাঁর মতামত শুনলে পাশকরা লোকেরা চটবেন।

অঘোরবাবুর এই আত্মনির্ভরতার বলে, গ্রামের সকল সাধারণ লোকই অঘোরবাবুকে একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বলে শ্রদ্ধা করত এবং তাঁর মতের সমর্থন করত। আমরা মনে মনে যাই ভাবি না কেন, জনসাধারণের এই মতের প্রতি বিপিনও প্রকাশ্যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে সাহস পেত না। কারণ পরম দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সাহিত্যরসেরও শেষ বিচারের ভার জনসাধারণেরই হাতে। ইতিমধ্যে আরও একটা কারণে গ্রামের লোকের কাছে অঘোরবাবুর প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গেল। ব্যাপারটা এই—এই সময়ে ক'লকাতায় একটি উদ্যমশীল সাপ্তাহিক প্রাচীনতম ঋষিদের বাণী ও আধুনিকতম নটিদের ছবি একসঙ্গে প্রকাশ করে বঙ্গসাহিত্যে একটা যুগান্তর আনছিল। এই বিখ্যাত পত্রিকার প্রশ্নোত্তর স্তম্ভে অঘোরবাবুর রচিত একটি সুচিন্তিত প্রশ্ন ছাপা হ'ল—"শিমূলের বীচি খেলে রাতকাণা দোষ সারে কিনা ?" হুলার হাট ও ধনেখালি থেকে এর উত্তর এল। কলসকাটি থেকে এল তার প্রত্যুত্তর। মোটকথা সাহিত্যজগতে একটা হুলস্থুল বেধে গেল। এর পরে অঘোরবাবুকে ঠেকিয়ে রাখা আর আমাদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। গ্রামের ছেলেরা হেড মাষ্টার মহাশয়কে গোপনে উপহাস করত, বিপিন কেবল উচ্চাঙ্গের সাহিত্য আলোচনা করত বলে তারা বিপিনের কথা বুঝত না এবং ভাবত ও একটা বড় মানুষী খেয়াল। কিন্তু অঘোরবাবু যা পড়তেন বা যা বলতেন তা তাদের বুঝতে কষ্ট

হত না—কাজেই অঘোরবাবুকেই তারা তাদের নেতৃত্বে বরণ করে নিয়েছিল। ইতিহাস প্রসিদ্ধ বহু জননায়কের মত তিনি কিন্তু জনসাধারণ সম্বন্ধে বিশেষ অবজ্ঞা প্রকাশ করতেন।

হেডমাষ্টার মশায় যখন সংযম, বিদ্যা, সরলতা, Plain living and high thinking প্রভৃতি বক্তৃতা দিবার বিষয়গুলি নিঃশেষ করে ফেললেন তখন বিপিন প্রস্তাব করল যে এবার বঙ্কিমের কোন উপন্যাস সভায় পড়ে শোনান হোক। অর্থাৎ বিপিনই বঙ্কিমের কোন একটা বই পড়ে আমাদের শোনাবে এই ছিল তার ইচ্ছা। বিপিন কেমন পড়ত সে ব্যক্তিগত আলোচনা করতে চাই না। কারণ একেত গ্রামে কথা বড় পল্লবিত হয়—তাছাড়া, সে আমার বন্ধু। সকাল সন্ধ্যায় তার পড়া শুনে শুনে···সত্যি কথা বলতে কি আমি ওসব বেশী বুঝি না। যাই হোক হেডমাষ্টার মশায় বিপিনের কথা অনুমোদন করলেন না, বললেন—"এইত বেশ হচ্ছিল, সভায় আবার নাটক নভেল পড়া কেন? এমন কিছু পড় যাতে কিছু শেখা যায়।" রসসাহিত্যের উপর এরূপ অন্যায় আক্রমণে অঘোরবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন—"বলেন কি উমেশবাবু, নাটক নভেল পড়লে অনেক কিছু শেখা যায়। এমন এক একটা বই আছে যা পড়লে মনে যে কি ভাব হয় আপনাকে বোঝাতে পারব না। অবশ্য ওসব বোঝবার ক্ষমতা থাকা চাই—আচ্ছা বিপিনবাবু এবার নাই পড়লেন, আমি একটা

বই পড়ি, দেখুন কেমন লাগে ; যে জায়গায় ননীর মৃত্যু হ'ল সে জায়গাটা শুনলে চোখের জল রাখতে পারবেন না।" হেডমাষ্টার মশায় তর্ক করতে পারতেন না। তিনি হয় বক্তৃতা করতেন না হয় চুপ করে থাকতেন। আজও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চলে গেলেন। সেদিন কিছুই ঠিক হল না। পরদিন সভা। সকালবেলা আমি বিপিনদের ওখানে বসে চা খাচ্ছি। সেই তিলেপরা সার্টটি গায়ে দিয়ে সমস্ত কোঁচাটা উঠিয়ে ডান কাঁধের উপর ফেলে হাসতে হাসতে অঘোরবাবু এসে উপস্থিত হ'লেন। এই অনাবশ্যক প্রসন্নতার হেতু বিপিন বা আমি কেউই বুঝতে পারলাম না। অঘোরবাবু এসেই কোন একটি অজ্ঞাত লেখকের 'কলঙ্কিনী' নামক একখানা উপন্যাস বের করলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহসহকারে বললেন—"এই বইটা পড়ব ঠিক করেছি।" বিপিনের মুখের দিকে লক্ষ্য করে আমি আপত্তি করলাম—"কই এ কথা ত কিছু স্থির হয় নাই।" বিপিন বঙ্কিম পড়া হ'ল না বলে বিরক্ত হয়েছিল। সে গম্ভীরভাবে কহিল— "এ সব বাজে নভেল পড়ার চেয়ে সভা উঠিয়ে দেওয়া ভাল।" সেদিন বিপিন ও অঘোরবাবুতে যে কথোপকথন হয়েছিল, তাকে ঠিক তর্ক বলা চলেনা, কারণ বিপিন বেশী কথা বলে নাই ;— কিন্তু যা বলেছিল তা অতি কড়াভাবে। আর অঘোরবাবু বলেছিলেন অনেক কথা, কিন্তু অতি বিনীত ও মিষ্টভাবে। যাই হোক, এ তর্কে অঘোরবাবুরই জয় হয়েছিল। তিনি চলে গেলে

বিপিনকে আমি এই কথা বলেছিলাম বলে বিপিন মিছামিছি রাগ করে বললে—"তুমি অতি নির্ব্বোধ।" আমি যদি পাল্টা জবাব দিতাম, তবে সেটা কি ভাল হ'ত? কিন্তু ভাবলাম, দরকার কি? তবে সত্যের খাতিরে একথা বলতে আমি বাধ্য যে তর্কপ্রসঙ্গে অঘোরবাবু যে সকল কথা বলেছিলেন, বিপিন তা খণ্ডন করতে পারে নাই। অঘোরবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—"এই বইখানা আপনি কি পড়েছেন?" বিপিন উত্তর করেছিল—"পড়ি নাই এবং পড়তেও চাই না।" অঘোরবাবু বললেন—"সে বেশ কথা, কিন্তু না পড়েই একটা বই সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা কি আপনি সঙ্গত বিবেচনা করেন? আপনি কি বলতে চান বাংলা সাহিত্য বঙ্কিমেই শেষ হয়ে গেছে—আর কোন নতুন লেখক বেরও হবে না আর তাদের লেখাও কেউ পড়বে না? অবশ্য বড়লোক হ'লে এক সুবিধা এই যে সকলেই তাদের ঢাক বাজায়—গরীবদের অনেক কষ্ট করতে হয়। আপনি এই বইটা পড়ে দেখুন, তারপরে আপনি যে মত দেবেন তা আমি শুনতে বাধ্য। আপনি অবশ্য আমার চেয়ে ঢের বেশী বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বড়লোক। তবে কিনা সাহিত্যটা ঠিক সে জিনিষ নয়। তা থাক, আপনি যখন অমত করলেন তখন আমি নাই পড়লাম।" বেচারা বিপিন! এসব যুক্তি তার নিজেরই যুক্তি, ভাগ্যক্রমে আজ নিজের বিরুদ্ধেই সে সব শুনতে হ'ল এবং কোন উত্তরই দিতে পারল না। বিপিন প্রতিজ্ঞা করল, সভা থাক আর যাক,

'কলঙ্কিনী' নামক উপন্যাস কিছুতেই পড়তে দেওয়া হবে না। অঘোরবাবু যে নিজেই পেছিয়ে গেলেন, তাতেও তার রাগ গেল না। সে বললে—"আমি ও বই পড়তে দেব না ; আর আপনি এসব পড়াশুনার কি বোঝেন যে সব কথায় যোগ দিতে আসেন ? আপনার লজ্জা করে না ? আপনার মত ইডিয়ট্ আমি আর দ্বিতীয় দেখি নি।" অঘোরবাবু হেসে বললেন—"ইডিয়ট্ ? হেঁ হেঁ—নাঃ—আপনি বড়ই রাগ করেছেন দেখছি—আচ্ছা তাহলে আজ আসি।" আমরা কেউই জবাব দিলাম না।

বলা বাহুল্য এই ব্যক্তিগত আলোচনার পর সাহিত্যসভা টিকল না। একে গালাগালি তাতে ইংরেজী গালাগালি! তখন গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে বিপিন অঘোরবাবুকে অকথ্য ভাষায় গলাগালি ত করেছেই—কেবল মারতে বাকি রেখেছে। ঠিক কি গালাগালি দিয়েছে তাই নিয়ে গুপে ও ভজহরির বহু-দিনকার বন্ধুত্ব ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হ'ল। উভয়েই খুব ভালো লোকের কাছে কথাটা শোনাতে নিজেদের মত পরিবর্ত্তন করতে রাজী হ'ল না। ভজহরি বললে—যার কাছ থেকে সে শুনেছে তাকে মিথ্যাবাদী বলা আর ভজহরিকে মিথ্যাবাদী বলা একই কথা। গুপে তারও উপরে গেল। সে বললে যে তার কথা যদি মিথ্যা হয় তবে সে ব্রাহ্মণের ছেলেই নয়। যাই হোক সেইদিন দুপুরবেলা হেডমাষ্টার মহাশয়, অঘোরবাবু প্রভৃতি আমাকে লিখে পাঠালেন যে এতদিন সভায় আসার দরুণ তাঁদের

নিজ নিজ কাজের বিশেষ ক্ষতি হয়েছে অতএব ভবিষ্যতে তাঁরা সভায় যোগ দিতে পারবেন না। পরস্পর শুনলাম যে অঘোরবাবু অন্য একটা সভা স্থাপন করবার চেষ্টা করছেন। কে কে সে সভায় যোগদান করবে সে সংবাদ বিপিনের অনুগত ধনঞ্জয় সরকার আমাদের জানিয়ে গেল। সে আরও একটা নতুন সংবাদ দিল। সে বলল—"এর মূলে আছে অভয়—দেখবেন ছোট বাবু, ওকে একটু শিক্ষা দিয়ে দেন—দেখবেন, সব থেমে যাবে।" অভয় তার বৈমাত্রেয় ভাই, সম্প্রতি তারা পৃথক হয়েছে। বিপিনের কথাও নানা আকারে পল্লবিত হয়ে অঘোর বাবুর দলে প্রচারিত হ'তে লাগল। শুনলাম বিপিন নাকি বলেছে যে দারোয়ান দিয়ে প্রকাশ্য পথে অঘোরবাবুকে অপমান করবে। আমি এসব কথার প্রতিবাদ করলে লোকে বলত—"ও তুমি! তুমি ত চিরকাল ছোটবাবুর (অর্থাৎ বিপিনের) ধামাধরা।" এও বলতে শুনেছি যে ছোটবাবু তো মানুষ মন্দ নয় যত দোষ ঐ···অর্থাৎ আমার। বলা নিষ্প্রয়োজন আমি বিপিনের অথবা কারোরই ধামাধরা নই—বিপিনকে খারাপ পরামর্শও দিইনি—আমার সে রকম স্বভাবই নয়। ইতিমধ্যে শুনলাম যে অঘোরবাবু না কি বিপিনের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনবেন। কথাটা সত্য কি না জানিনা তবে একদিন সন্ধ্যাবেলা হাটের মাঝখান দিয়ে চলেছি—ঘোড়া হাঁকিয়ে ধূলো উড়িয়ে মাথায় চাদর বাঁধা একটা লোক এসে উপস্থিত হ'ল—

অন্ধকারে ভাল করে চেনা গেল না—কিন্তু কৈলাস মুহুরী বলেই মনে হল এবং লোকটা কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা পোষ্টাফিসের দিকে চলে গেল। এ খবর ধনঞ্জয়ই আমাদের দিয়েছিল। কৈলাস মুহুরীকে ভয় করত না এমন লোক আমাদের ওদিকে ছিল না বললেই হয়—অবশ্য বাবুদের কথা স্বতন্ত্র। কৈলাস ছিল মহকুমার কোন একজন বড় মোক্তারের মুহুরী। কিন্তু সেজন্য নয়—সে ছিল ও অঞ্চলে বেনামী চিঠি লেখার ওস্তাদ, সেই জন্যে সকলেই তাকে ভয় করত। হেডমাষ্টারের নামে সেক্রেটারীর নিকট, সেক্রেটারীর নামে বাবুদের নিকট, নায়েবদের নামে ম্যানেজারের নিকট, পোষ্ট-মাষ্টারের নামে উপরিওয়ালার নিকট, ইউনিয়ান বোর্ডের সভাপতির নামে সার্কেল অফিসারের নিকট কত চিঠি যে সে তার এক জীবনে লিখেছে তার ঠিক নাই এবং তার যে কী ভীষণ ফল হয়েছে—কত লোক বদলি হয়েছে, কত লোকের চাকরী গেছে, কত লোকের সম্বন্ধে তদন্ত হয়েছে সে সব কাহিনী আমাদের গ্রামের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। কৈলাস মুহুরী অবশ্য বেনামি চিঠির কথা কখনও স্বীকার করত না। লোকে বলত সেইখানেই ত তার আসল চালাকি। রাত্রেই কৈলাসের চলে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে অন্তত আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। ব্যাপার যখন শেষ পর্য্যন্ত কৈলাস মুহুরীতে গিয়ে পৌঁছল তখন সভা উঠিয়ে না দিয়ে আর পারা গেল না। সভা

বন্ধ হয়ে গেল। বিপিন কহিল—"যে গ্রামে মূর্খের সংখ্যা এত অধিক সে গ্রামের কিছু উন্নতির চেষ্টা করা নিষ্ফল।" হেডমাষ্টার মহাশয় বললেন—"সভা থাকলেই নাটক নভেল পড়া চলত, এ অবস্থায় সভা উঠে যাওয়াতে গ্রামের মঙ্গলই হয়েছে।" দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের vernacular সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চ ধারণা ছিল না—যখন সন্দেহ করলেন যে উক্ত vernacular সাহিত্য অলোচনা করাই সভার প্রধান উদ্দেশ্য—তখন থেকেই অনেকটা উদাসীন হয়েছিলেন—তারপর সভা একেবারেই উঠে যাওয়াতে খুসীই হ'লেন। গ্রামের বিজ্ঞেরাও খুসী হলেন কারণ সভার নশ্বরতা সম্বন্ধে তাঁরা যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা হাতে হাতে ফলে গেল।

* * * *

সমস্ত যখন শেষ হয়ে গেল তার' বোধ হয় দিন পোনেরো পরে হঠাৎ কর্ত্তার নামে একখানা চিঠি এল—লেখকের নাম নাই। অশুদ্ধ বানান ও কাঁচা হাতের অক্ষরে তাতে যা লেখা ছিল তা মোটামুটি এই—সুশীল মুখুয্যে (আমার নাম) লোক খারাপ, বিপিনকে সর্ব্বদা কুপরামর্শ দিয়ে থাকে। তার মতলব ভাল নয়। বিশেষতঃ টাকা পয়সা সম্বন্ধে সে অত্যন্ত অসৎ। এ সম্বন্ধে কর্ত্তা গোপনে তদন্ত করলেই জানতে পারবেন যে সুশীল প্রতি হাটবারে হাট থেকে সভার নাম করে কোন বার পাঁচ টাকা, কোন বার পাঁচ টাকা সওয়া সাত আনা, কোন বার

বা সাতটাকা এইরূপ একুনে প্রায় পঞ্চাশ টাকা উঠিয়েছে এবং সে টাকা কোথায় গেল সেটা দেখা দরকার। তা ছাড়া পুলিশের খাতায় সুশীলের নাম আছে অতএব বিপিনের পক্ষে তার সংসর্গ শুভ নয়।

টাকা চুরির কথাটায় আমার কোন অনিষ্ট হ'ল না। পুলিশের খাতায় নাম থাকার কথাও কেউ বিশ্বাস করল না—কারণ গ্রামে আমার মত দুর্ব্বল ভীতু লোক আর কেহ নাই—এ কথা সকলেই জানতেন। তবু পাকা হাতের মোসাবিদার শেষ ইঙ্গিতের ফল ফলল—ছুটি শেষ হবার পূর্ব্বেই আমাকে কলিকাতার মেসে ফিরতে হ'ল।

তখন শীতের শেষে বসন্ত এসে উপস্থিত হয়েছে, তাই সহরের বাইরে আকাশ নির্ম্মল নীল, গাছের পাতা সবুজ, নতুন ঘাস পীত,—কিন্তু সহরে সে সংবাদ তখনও পৌঁছয় নি ; সেখানকার আকাশ কলের ধোঁয়ায় কালো হবার উপক্রম হয়েছে, বড় বড় বাড়ীর ভিতর এমন একটা সবুজ গাছ ছিল না যেখানে পাখীরা এসে আশ্রয় পেতে পারে।

সে যখন সহরে প্রবেশ করল, তখন ভাল করে ভোর হয় নি ; সবেমাত্র সহরের প্রকাণ্ড কালো লোহার দরজা খোলা হয়েছে। আগের দিন অবিশ্রাম বৃষ্টি হওয়াতে কালিমা-ধৌত আকাশ কোমল নীল দেখাচ্ছিল, আর খণ্ড খণ্ড হালকা রঙীন মেঘ কালকের ঝড়ে-ওড়া গোলাপের পাঁপড়ির মত মনে হচ্ছিল। সে যখন সহরের ফটকের নীচে দিয়ে এল, তখন নিদ্রালু প্রহরীরা তার দিকে তাকিয়ে দেখল ; তার চুল লম্বা, চোখ ছুটি কালো ও গভীর, তার পোষাক অদ্ভুত, আর তার হাতে সুন্দর একটি বীণা। তাই তারা তাকে বাধা দিল না। রাস্তার পাশে বৃহৎ বিপণি খুলে বণিক বসেছিল। সকালবেলা উঠে সহরের লোকের ঘুম ভাঙ্গবার আগে, তার জিনিসপত্র গুছিয়ে খরিদ্‌দারদের জন্যে প্রস্তুত হবে বলে বণিক রাত থাকতে উঠেছিল ; কিন্তু আজকের ভোরের পাগলা হাওয়া তার মনের সঙ্কল্পগুলোকে যেন এলোমেলো করে দিল। সে রাস্তার দিকে চেয়ে চুপ করে বসেছিল। নতুন লোকটিকে রাস্তা দিয়ে যেতে

দেখে সে চেঁচিয়ে ডাকল—ওহে তোমাকে নতুন লোক দেখছি ; কি চাও তুমি এ সহরে ?

সে বললে, আমি কাজ চাই।

—কাজ ? কি কাজ তুমি পার ? কোনও দিন তুমি কোনও কাজ করেছ ? সে উত্তর করল,—সহরের বাইরে বনের ভিতর গাছের তলায় লম্বা লম্বা কচি ঘাসের উপর জ্যোৎস্না রাত্রে পরীরা যখন হাত ধরাধরি করে নাচে, আমি তাদের মাঝখানে বীণাটি বাজিয়ে গান গাই।

বণিক ভেবেছিল এই সুন্দর ছেলেটি বুঝি চাকরী চায়, কিন্তু তা যখন সে চাইল না এবং তার কথাও যখন বণিকের কাছে দুর্ব্বোধ্য বলে মনে হ'ল, তখন সে নিরুৎসাহে বললে—ওহো ! তুমি বুঝি অন্য কোন সহর থেকে কোন খবর এনেছ ? আগন্তুক বললে—না, আমি শুধু গান গাই। আমি একজন কবি।

বণিক।—আমাদের এখানেও তো একজন কবি আছে, কিন্তু সেতো তোমার মত নয়—সে যা বলে, তাতো আমরা সবাই বুঝতে পারি ; আমাদের সহরে কোন বিখ্যাত লোকের মৃত্যু হলে, কিম্বা কোন বিশেষ ঘটনা ঘটলে, সে তাই নিয়ে দিব্যি ছঁড়া বাঁধে।

কবি।—আমি ঘটনা নিয়ে ছঁড়া বাঁধিনে, আমি গান গাই।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, গান ত গাও,—কিন্তু তার ভিতর কিছু পদার্থ থাকে তো ? খবর টবর কিছু দাও তো বটে ? আমি তোমাকে

একটা পরামর্শ দিচ্ছি, শুধু গান গাইলে হবে না, গানের ভিতর যদি এমন একটা কিছু বর্ণনা করতে পার যা শুনে লোকের লোমহর্ষণ হবে, তবে তোমার গান শুনতে আমাদের ভাল লাগবে।

কবি।—আমার কাছে সে রকম কোনই খবর নাই।

—কিন্তু খবর না থাকলে চলবে কেন?

—খবর? আচ্ছা এই ত খবর,—আজকের সকাল বেলাটি বড় মধুর। আসতে আসতে সহরের বাইরে দেখলাম একটা গাছের ডালে নানা বর্ণের একটা মাছরাঙ্গা বসে আছে! আর আকাশের গায়ে উড়ে উড়ে একটা কোকিল ডেকে বলছে—বসন্ত এসেছে! ধরায় বসন্ত এসেছে।

বণিক বিস্মিত হয়ে অনেকক্ষণ কবির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বললে, বাপু এতো রোজই হচ্ছে। এটাতো একটা বিশেষ কিছু নতুন কথা নয়। তুমি পৃথিবী ঘুরে বেড়াও,—এমন কি কিছুই জাননা, যা আমাদের শোনা উচিত? ধর কোন যুদ্ধ বিগ্রহ, কি ভূমিকম্প, কি দুর্ভিক্ষ,—এসব খবর তুমি বুঝি রাখ না?

কবি মাথা নেড়ে বললে—না, আর যদি জানতামও,—তা হলেও তোমাদের বলতাম না। আমি তোমাদের আনন্দ দিতে চাই, সুখী করতে চাই। বণিক বললে, তাহলে তোমার এখানে কিছু হবে না বাপু। তুমি কি ভাব যে আমরা বিছানায় শুয়ে

শুয়ে তোমার এই মাছরাঙ্গা আর কোকিলের কথা শুনব আর গোল্লায় যাব? উন্নতি চাই হে,—উদ্যম চাই। তোমার কথা শুনলে আলসেমি বেড়ে যাবে। বাপু হে, তুমি নিতান্তই পাগল দেখছি। ভাবছ যে আকাশ নীল আর মাছরাঙ্গা নানান রঙে রঙীন, এই খবর দিয়ে তুমি সহরের লোকদের ভোলাবে—তারা অত বোকা নয়। তোমাকে দুটো পয়সা দেওয়া দূরে থাকুক, তোমাকে চারটি খেতেও কেউ দেবে না। তার চেয়ে তুমি আমার এখানে খেয়ে যাও।

কবি আশ্চর্য্য হয়ে বললে, তবে তুমি আমাকে তোমার বাড়ীতে রাখতে চাচ্ছ কেন?

—বলতে পারি না বাবা, তোমার মুখটি আমার মনে ধরেছে।

কবি বলল, কিন্তু তুমি যদি আমার গানগুলো ভালবেসে আমায় ডাকতে, তাহলে আমি এর চেয়ে সুখী হতাম।

সকালবেলা সেই বণিকের ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করে, কবি বীণাটি নিয়ে আবার সহরে বেরিয়ে পড়ল। সে চলে গেলে বণিক বললে, আহা! তার মাথাটায় একটু গোল ছিল, কিন্তু ছেলেটি বড় সরল। বণিকের স্ত্রী বললে, হ্যাঁ দেখেছ তার চোখ দুটি ঠিক আমার সেই ছেলের মত। বণিকের একটি ছেলে কিছুদিন হ'ল মারা গেছল।

বণিকের বাড়ী ছেড়ে কবি মহাপাত্রের বাড়ীতে উপস্থিত হ'ল কিন্তু দ্বারীরা প্রথমে ঢুকতে দিলে না। মহাপাত্র তখন ঘুম

থেকে সত্ত উঠে বন্ধুদের সঙ্গে গতরাত্রের ভোজের এবং নটীদের নাচ গানের সমালোচনা করছিলেন,—খবর পেয়ে আদেশ দিলেন, গানওয়ালাকে ডাক। কবি তাঁর সামনে এলে তিনি বললেন,—একটা গান গাও তো। কবি বিনীত ভাবে বললে,— কি গান গাইব? মহাপাত্র বললেন, সব চেয়ে নতুন ফ্যাসানের একটা গান গাও। তরুণ কবি বীণাটি বাজিয়ে, জলাশয়েয় ধাবে সেই বিচিত্র বর্ণের মাছরাঙ্গা আর সেই উন্মাদ কোকিলটার গান গাইলে। মহাপাত্র বিরক্ত হয়ে বললেন, কি হে! তুমি আমাদের বোকা পেয়েছ না কি? একে তুমি নতুন গান বল? তুমি যদি নতুন গান না-ই জানো, তবে গান গাইতে এসো কেন? আমরা শুনতে চাই—আমাদের এই পাড়াপড়শীদের কথা, তারা কি করে, তাদের স্ত্রীরাই বা কে কি করে। ওই যে রাস্তার ধারে মোটা বণিকটা বাস কচ্ছে, শুনতে পাই ও বেজায় লোক ঠকায়। আরও কিছু দূরে একজন মস্ত মহাত্মা আছেন, গোপনে গোপনে তিনি অনেক কুকাণ্ড করেন। এই সব নিয়ে তুমি একটা গান রচনা কর, তবে ত বুঝি তুমি একজন কবি। কবি বললে, এত পঙ্কিলতার ভিতর থেকেও তোমার পঙ্কিলতার সাধ মিটল না, গানেও তুমি তাই চাও। মহাপাত্র রাগে চীৎকার করে বললেন, বেয়াদব! ঠক্ কোথাকার! তোমার কোকিল আর তোমার মাছরাঙ্গা, না তোমার মাথা! বেরিয়ে যাও তুমি আমার বাড়ী থেকে! কবি আবার রাস্তায় বেরল।

ধীরে ধীরে পণ্ডিতের কুটীরের দাওয়ায় বসে, তার বীণাটিতে ঝঙ্কার দিতে লাগল। পণ্ডিত তখন চশমা চোখে দিয়ে সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে মস্ত পুঁথি লিখছিলেন। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, বৎস, তুমি অন্যত্র গমন কর—আমি এখন বড় ব্যস্ত আছি। কবি বললে, আপনাকে আমি গান শোনাতে এসেছি, আপনি একটি গান শুনুন। তারপর সেই গানটি গাইল। পণ্ডিত—অসাধারণ তাঁর পাণ্ডিত্য—গান শুনে বিশেষ চিন্তান্বিত হলেন, তারপর বললেন, বৎস, একটু অপেক্ষা কর, আমি তোমার ভ্রান্তি দেখিয়ে দিচ্ছি।—এই বলে তিনি তাঁর এক জীর্ণ পুঁথি দেখিয়ে বললেন, দেখ বইতেই লিখেছে যে, প্রকৃতির সম্বন্ধে গান যে যুগে লেখা উচিত ছিল, সে হচ্ছে মধ্য যুগ। আজকাল বাস্তবের যুগ চলছে। অবশ্য তোমার কবিতাতে যে প্রশংসনীয় কিছু নেই, আমি তা বলছিনে। তোমার কবিতার সঙ্গে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস না জানাতে, তুমি ভুল বিষয় নির্ব্বাচন করেছ। আজ আমি বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছি, অন্য একদিন এলে এ বিষয় তোমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেব। এই বলে আশীর্ব্বাদ করে কবিকে তিনি বিদায় দিলেন। পণ্ডিতের বাড়ী ছেড়ে কবি অনেক ঘুরল,—দেখল কেউ আর গান শুনতে চায় না। সবাই বললে—ওহে গানওয়ালা, এখন কাজের সময়, ওসব ছেলেমানুষির সময় নয়—তুমি অন্য জায়গায় যাও।

কবির বিদায়

বিকেল হয়ে এল। বিষণ্ণ মনে, ক্লান্ত পদে, কবি সহরের প্রান্তে গিয়ে বসে আপন মনে বীণাটি বাজাতে লাগল, তার বীণার সুরে তার চোখের জল যেন উথলে উঠতে লাগল। তখন ছেলেরা পাঠশালা থেকে ফেরবার পথে একে একে অনেকে এসে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তার গান শুনতে লাগল। তারা শুধালে—কে ভাই তুমি? সে বললে—আমি ভাই কবি। তারা বললে, ভাই কবি, তুমি কেবল এমন গান গাও কেন, যাতে চোখে জল আসে? এমন একটা গান গাও, যা শুনে আমাদের আনন্দ হবে। সে তখন আর একটা গান ধরলে, আর তারা তাদের মোটা মোটা বেল ফুলের মত হাত ধরাধরি করে কবিকে ঘিরে নাচতে লাগল। কবির মুখে আবার হাসি ফিরে এল। এমন সময় সহরের লোকেরা এসে গান থামিয়ে দিলে, আর ছেলেদের খুব বকতে লাগল—বলল, তোরা বুঝিস নে সুঝিস নে, যা শুনিস তাতেই খুসী হয়ে উঠিস; পণ্ডিত মশাই নিজে বলেছেন—ওতে শিখবার কিছুই নেই। তারা কবিকে বলতে লাগল—তুমি যদি এমন কিছু জানো যাতে আমাদের হিত হয় তো বল, না হলে ছেলেপিলে ক্ষেপিও না।

কবি বললে—আমি তোমাদের এই কথা বলতে চাই যে, তোমাদের মাথার উপরকার ওই আকাশ কত নীল, তোমাদের পায়ের নীচের সবুজ ঘাস কত কোমল। তারা উত্তর করলে—ও আমরা অনেক কাল জানি। কবি অনেক অপমান সহ্য করেছে,

তাই রেগে বললে—জাননা! তোমরা তা জাননা! যদি তোমরা জানতে আজ নীল আকাশে কি স্নিগ্ধতা, আজ এই বসন্তের আলোতে কি মাদকতা, আজ এই মাতাল হাওয়ায় কি কাজ-ভোলানো আহ্বান,—তাহলে তোমরা আজ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারতে না। জানলে, তোমরা গান গাইতে গাইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে ওই দূর নীল পাহাড়ে চলে যেতে! তারা উপহাস করে বললে, আর আমাদের কাজ কে করে দিত? কবি বললে, কাজের কথা তা'হলে মনেই থাকত না! সহরের লোকেরা যখন কবিকে ভৎ র্সনা করে ছেলেদের নিয়ে ঘরে চলে গেল, তখন কবি আপন মনে তার সেই দুঃখের গানটি গাইতে লাগল। এমন সময়ে মহাপাত্রের মেয়ে অলকা ধীরে এসে তার পিঠে হাত দিলে,—বললে, ভাই কবি, তোমার জন্যে আমি কিছু ফল এনেছি। কবি দুই হাত পেতে আঙুর আপেল নিয়ে একটু একটু করে খেতে লাগল, আর অলকা মায়ের মত যত্নে তাকে খাওয়াতে লাগল। যখন খাওয়া শেষ হয়ে গেল, তখন অলকা তার দু'খানি ছোট হাত দিয়ে কবির হাত ধরে, নীচু হয়ে কবির কপালে চুমো খেলে। তার খোলা কালো ঘন চুল কবির চোখ বুক ঢেকে ফেলল। কবি বললে—সুন্দর! তুমি সুন্দর! কালো ঘন অন্ধকারের মত তোমার চুল, কালো শ্রাবণের মেঘের মত কালো তোমার দুটি চোখ। অলকা তার সুডোল দু'খানি বাহু দিয়ে কবির গলা জড়িয়ে ধরে বললে, আমি তোমাকে

ভালবাসি! কবি বললে, আমার গান—সে কি তুমি ভালবাস না? অলকা উত্তর দিলে—বাসি, কিন্তু তার চেয়ে তোমাকে আমি বেশী ভালবাসি। কবি তাকে দু'হাতে ঠেলে দিয়ে বললে, তুমিও আর সবারই মত—আমার কবিতাই যে আমার সব, তা কেন তুমি বুঝতে পারো না? অলকা বিষণ্ণ হয়ে চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। তার চোখ জলে ভরে এল। কবি অনুতপ্ত হয়ে, তার দুইটি হাত ধরে তাকে কাছে টেনে নিলে, তাকে চুমো খেয়ে বললে—তুমি যদি আমার গান ভালবাসতে! একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তার বুকটা চেপে ধরল। অলকা বললে, তুমি যে তোমার গানের চেয়েও বড়—আমি গান শুনব কি করে, আমি কেবল তোমায় দেখি। কবি বললে,—হায় রে! আমার গান, তোমারও তা ভাল লাগল না?—উপরের আকাশে অন্ধকার ঘনিয়ে এল, আর একটি একটি ক'রে তারা ফুটে উঠল। অলকা চলে গেল। কবি আবার বীণাটি নিয়ে বসল, পাড়ার লোক শুনল সারারাত কে যেন বীণা বাজাচ্ছে। বীণাতে একটা নতুন সুর শোনা গেল।

সকালবেলা প্রহরীরা কবিকে ধরে বিচারকের কাছে নিয়ে গেল। বললে, প্রভু! এ সমস্ত রাত ধরে বীণা বাজিয়েছে, আর ছেলেদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে, একে কঠোর সাজা দিতে হবে। এ ব্যক্তি নিষ্কর্ম্মা, ছেলে ঠকিয়ে পয়সা নেবার চেষ্টা করে।

কবি বললে,—প্রভু! আমি কাজ করিনা বটে, কিন্তু ঠক্ নই,—আমি গান গাই। বিচারক বললেন,—ওহো, তুমি একজন কবি, কি গান তুমি কর, কি তত্ত্ব তুমি জান, আমাকে বোঝাও দেখি?

—আমাকে যদি গান গাইবার অনুমতি দেন, তা হ'লে বোঝাতে পারি। প্রবীণ বিচক্ষণ বিচারক মাথা নেড়ে বললেন,—আচ্ছা গাইতে পার; কিন্তু আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি, আমিও একদিন কবিতা লিখতাম, গান গাইতাম; আমি এ বিষয় বিলক্ষণ জানি; আমাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। কবি সেই সবুজ ঘাসের উপর শাদা ফুল ফোটার গান গাইল। বিচারক বললেন—ও আমি আগেই জানতাম। সহরের সব লোক সেই সঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, ও আমরাও জানতাম। কবি তারপর নীলাকাশে তারা ওঠবার গান গাইল। বিচারক বলিলেন,—এ কেবল হাল্‌কা ভাবুকতা। কবি তখন সেই জ্যোৎস্নার আলোতে পরীদের নাচের গান গাইল। বিচারক বললেন,—পরীর কথা আমরা বিশ্বাসই করি না। যে গানের বিষয় মিথ্যা, সে গান কখনও ভাল হতে পারেনা। কবি তখন রেগে সহরের লোকদের নিন্দে করে গান গাইল—বললে তোমরা অর্থের দাস, অর্থ তোমাদের দেবতা,—আকাশের আলো, পাখীর গান, ফুলের গন্ধ তোমাদের কাছ থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে যায়, এমনি হতভাগ্য তোমরা! একেই ত বলে পাপ, পাপী

তোমরা! তোমাদের আশা নাই, মুক্তি নাই, তোমাদের আননে ক্লান্তি, নয়নে লোলুপ বুভুক্ষা, মনে অশান্তি! একেই ত বলে নরক। শুনে সমস্ত সমবেত লোক হাহাকার করে উঠল। তা'রা কাতর হয়ে ভগবানের নাম করতে লাগল।

বিচারপতি উঠে কবিকে হাত ধরে বসিয়ে বললেন—হে কবি—এমন গান তুমি আগে গাওনি কেন? এ রকম গান শুনে লোকের মোহনিদ্রা ভাঙ্গে। চেয়ে দেখ, সবাই কাঁদছে। এবার আমাদের চৈতন্য হ'ল। এর পর তুমি যখন আবার আমাদের সহরে আসবে তখন এমন গান রচনা করে এনো, যাতে মুক্তির উপায়টা আমরা জানতে পারি। ধন্য তুমি—তোমাকে প্রণাম। পণ্ডিত উঠে বললেন—কবি আজকে তোমাকে আমরা কবিরত্ন করে দিলাম, এই নাও তোমার মান-পত্র। তখন মহা কোলাহলে সমস্ত লোকেরা কবির জয়ধ্বনি করতে লাগল। বণিক, মহাপাত্র এবং আর আর ধনী লোকেরা একটি থলেতে স্বর্ণমুদ্রা এনে বললে—কবি, এই নাও আমাদের উপহার।

কবি যখন ভিড় ঠেলে পথে বের হ'ল তখন অলকা এসে তার সুন্দর আঙ্গুল থেকে একটি আংটি খুলে কবির হাতে দিয়ে বললে—কবি—ভুল না।

সহরের বাইরে এসে কবি তার ঝুলি থেকে মান-পত্র বের করে ছিঁড়ে ফেলে দিল, টাকাগুলো পথের পাশে ছড়িয়ে

ফেলল। তার পর সেই আংটিটি হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। একটুখানি ম্লান হাসি তার মুখের বিষাদ আরও বাড়িয়ে দিল। আংটি আবার ঝুলির ভিতর রেখে দিল। তারপর বনের ভিতর সরু পথটি দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্বপন-পসারী

রাজার দূরবিস্তৃত ফুলের বাগান যেখানে শেষ হয়ে মস্ত বন আরম্ভ হয়েছে, সেইখানে ছেলেটি দাঁড়িয়ে ছিল। তার পরিচ্ছদের অবকাশ দিয়ে চাঁদের কিরণ তার বুকের উপর, তার অনাবৃত হাত পায়ের উপর পড়াতে তার স্বাভাবিক গৌরবর্ণ আরও শুভ্র দেখাচ্ছিল। কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের ছায়াতে তার মুখ অত্যন্ত ফ্যাকাসে মনে হচ্ছিল। তার হাতে ছিল কতগুলি শিশির ভেজা গোলাপ, যুঁই আর রজনীগন্ধা—সেগুলো সে রাজার বাগান থেকে সঞ্চয় করেছিল। তার পিছনে ঘন নীল বন, তার মাথার উপরে তরল নীল জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশে অসংখ্য তারা—কিন্তু সে দিকে তার চোখ ছিল না। সে দেখছিল তার সামনে দূরে পরীদের প্রাসাদের মত রাজার বাড়ী। সে বাড়ীর হাজার জানালায় হাজার রঙের বাতি—কোনটি লাল, কোনটি গোলাপী, কোনটি বা সোনালী। সে ভাবতে লাগল স্বপ্নে যা অনেক দিন দেখেছি আজ তা জেগে দেখলাম। তার মন বিস্ময়ে কেবলি বলতে লাগল—কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! তাকিয়ে তাকিয়ে তার চোখে জল এল, আর তার জলভরা চোখের সামনে সেই আলোর মালা যেন দুলতে লাগল। আকাশের কোন কোণে যেন একটা পাখী ডাকছিল—কিন্তু সে গান তার কানেও গেল না। লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে খরগোসগুলো ছুটে পালাচ্ছিল কিন্তু তাদের চলার শব্দ সে শুনতেও পেল না। সে যেন দূরাগত

কোন বাঁশীর তান আকণ্ঠ পান করছিল। সেই তানের তালে তালে তার হাতের ফুলগুলো তুলতে লাগল, তার বুক নাচতে লাগল।

বালক পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল। মেয়েটি যখন এল সে জানতেও পারলে না। মেয়েটি খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল তারপর আস্তে আস্তে ডাকল—বন-দেব! সে এত আস্তে যেন মনে হ'ল পাশের বেলফুলের গাছটি শিউরে উঠে চঞ্চল বাতাসকে ফিরে ডাকল। বালকের একবার সন্দেহ হ'ল সত্যি কেউ ডাকল কিনা, তারপরে ফিরে মেয়েটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল—দেখতে পেল তার উত্তেজিত ছোট মুখখানি আর তার ফিকে নীল রঙের শাড়ীটি। বালক জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি পরী? মেয়েটি বললে—না, আমি নন্দিনী, আর তুমি কি বনদেবতাদের ছেলে? বালক সে কথার কোন উত্তর দিলে না। সে নন্দিনীকে দেখতে লাগল—সে ভাবল এই চাঁদের কণার মত সুন্দর, ফুলের মত কোমল মেয়েটি কোথা থেকে হঠাৎ এখানে এল। গাছ থেকে যেমন ফুলটি পড়ে এ যেন আকাশ থেকে তেমনি করে পড়ল। নন্দিনী বললে—আমি পরী দেখতে এসেছি—ঐ যে বন দেখছ ওর ভিতর একটা পরিষ্কার জায়গা আছে সেখানে ঘাসের উপর কত রঙের ফুলই যে ফুটেছে! সেখানে আমি দিনের বেলায় গেছি, ঠিক মনে হ'ল পরীরা আমাকে দেখে গাছের তলা দিয়ে কোথায় পালিয়ে

গেল। আজ রাত্রে গাছের আড়াল থেকে চুপি চুপি তাদের দেখব। তারা কেউ টেরও পাবে না—তুমি যাবে ভাই, আমার সঙ্গে? বালক মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলে সেও যাবে। সে কথা কইল না—নন্দিনীর সাথে কথা কইতে তার ভয় হচ্ছিল। আলো ও ছায়া খচিত বনের সরু পথ দিয়ে তারা পাশাপাশি চলতে লাগল। বালকের হাতের ফুলগুলির ঠাণ্ডা পাঁপড়িগুলি এক এক বার নন্দিনীর চুলে, গালে লাগতে লাগল। সে ছেলেটির দিকে ফিরে শুধু একটুখানি হাসল।

নন্দিনী জিজ্ঞাসা করলে—আমি যখন তোমাকে ডাকলাম তখন তুমি কি দেখছিলে? বালক বললে—পরীদের বাড়ী। নন্দিনী হেসে বললে—দূর, সে পরীদের বাড়ী নয়—সে আমাদের বাড়ী। বালক কম্পিতবক্ষে আবার তার দিকে তাকালে। ভাবলে তবে বুঝি এই সুন্দর মেয়েটি পরীদের রাণী। যেতে যেতে বনের ভিতর একটা জলাশয়ের ধারে তারা উপস্থিত হ'ল। গভীর জলের উপর ভাসমান শাদা শাদা বুদ্‌বুদের উপর চাঁদের আলো ঝিক্‌মিক্ করছিল। নন্দিনী বললে এইখানে পরীরা স্নান করে। তুমি সাঁতার কাটতে পার? বালক উত্তর করলে—না। নন্দিনী বললে, যদি জানতে তো বেশ হ'ত, পরীদের মত আমরাও এখানে নাইতাম। সেখান থেকে তা'রা পরীরা যেখানে নাচে সেখানে গেল। সেখানে চারিদিককার গাছের মাঝখানে খোলা জায়গায় জ্যোৎস্নার জোয়ার আটকা

পড়ে গেছে। তারা চুপ করে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল। পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো তাদের মাথায় গায়ে এসে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে নন্দিনী ফিস্‌ফিস্ করে বললে—তোমার যদি ইচ্ছে করে আমার হাত ধরতে পার। বালক হাতের ফুলগুলি ফেলে দিয়ে নন্দিনীর হাতখানি তার মুঠোর মধ্যে নিলে। সে টের পেল তার হাতের ভিতর নন্দিনীর ছোট্ট হাতটি আবেগে কাঁপছে। নন্দিনী বলল, আমার কিন্তু একটুও ভয় করছে না। তা'রা চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল। এমন সময়ে একটি লোক হঠাৎ গাছের তলার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল, তার বড় বড় কালো চুল আর তার কাঁধে একটি ঝুলি। নন্দিনী প্রায় চেঁচিয়ে উঠছিল কিন্তু বালক নিজের অজ্ঞাতসারে তার হাতটি শক্ত করে ধরাতে সে সাহস পেল। বালক আগন্তুককে জিজ্ঞেস করলে—তুমি কে? লোকটিও তাদের সেখানে দেখে প্রথমটা আশ্চর্য্য হয়েছিল। সে বললে—তোমরা এত রাত্রে এখানে কি করছ? তার গলার স্বরে একটা স্নিগ্ধতা ও আশ্বাসের সুর ছিল। নন্দিনী বললে, আমি পরী দেখতে এসেছি। লোকটি ছেলেটির দিকে ফিরে বললে—তুমিও কি পরী দেখতে এসেছ নাকি—ফুল দেখছি যে! তুমি ফুল তুলছিলে বুঝি? ছেলেটি বললে—হ্যাঁ আমার বোনের জন্য ফুল তুলেছি।

—তোমার বোন কি ফুল খুব ভালবাসে?

বালক বললে, হ্যাঁ—কিন্তু সে বেঁচে নেই। লোকটি থমকে বালকের মুখের দিকে একবার তাকাল; তারপর যেন আপন মনে বললে—কথা! এই বয়সে কথা গাঁথতে শিখেছে। কথার দাসত্বের মত শাস্তি আর নেই—হ্যাঁ ভাই, তোমায় কে শিখিয়েছে যে যারা মরে গেছে তারা ফুল ভালবাসে? বালক কোন উত্তর দিলে না। নন্দিনী জিজ্ঞেস করলে—তুমি কি খুঁজতে এসেছ তা'তো আমাদের বললে না। লোকটি নীরবে একটু হেসে চারদিকে তাকালে, যেন তার ভয় হচ্ছিল পাছে তার গোপন কথাটি কেউ শুনতে পায়, তারপরে বললে—স্বপ্ন। নন্দিনী তার কথাটি বুঝতে পারল না—ভ্রূ তুলে জিজ্ঞেস করলে—আর তোমার ঝুলিতে? লোকটি উত্তর করলে—ওতে আমার স্বপ্ন কুড়োন আছে। তা'রা সতৃষ্ণ-নয়নে সেই ঝুলিটা দেখতে লাগল। মেয়েটির ইচ্ছা করতে লাগল ঝুলিটার মুখ খুলে দেখে কি রকম স্বপ্ন। সে শুধালে—কি রকম দেখতে তোমার স্বপ্নগুলো? লোকটি বললে—তোমার স্বপ্নের মত, এর স্বপ্নের মত। কিন্তু বোন, যারা জীবনে সুখী হ'তে চায় তারা ত ও দেখতে পায় না। তার চেয়ে তোমরা চুপ করে আমার পাশে বস, আমি বাঁশী বাজাচ্ছি—শোন। তারা ঘাসের উপর বসে পড়ল। লোকটি তার ঝুলির ভিতর থেকে একটি বাঁশী বের করে বাজাতে লাগল। তাদের মনে হ'ল যেন বাঁশীতে ফুঁ দেওয়া মাত্র তার ফাঁক দিয়ে একটি পরী বেরিয়ে পড়ল আর তাদের চারদিকে ঘুরে ফিরে

নাচতে লাগল। চাঁদের আলোতে সে পরীর বসন একবার আকাশের মত নীল, একবার কচি ঘাসের মত সবুজ, একবার ডালিমের মত লাল দেখাতে লাগল—আর প্রতিধ্বনিগুলি যেন ছোট ছোট পরীর মত তাদের শাদা শাদা পায়ে ছুটোছুটি করে বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে সেই নাচে যোগ দিতে লাগল। নন্দিনী তার ডাগর চোখ আরও ডাগর করে বাঁশীর তান শুনছিল। বালক নিশ্চল হয়ে ছিল, যেন তার বুকের স্পন্দনও থেমে গিয়েছে। তারপর যখন সুরের পরীটি শ্রান্ত হয়ে পড়ল আর প্রতিধ্বনিগুলি রুদ্ধশ্বাস হয়ে বনের ভিতর ফিরে গেল তখন সেই লোকটি বাঁশীটি নামিয়ে জিজ্ঞেস করল,—কেমন ভাই, কেমন লাগল তোমাদের? নন্দিনী খুসী হয়ে বললে—বেশ লাগল··· উঃ আমার হাতে লাগচে—তুমি এমন চেপে ধরেছ। বালক তার হাত ছেড়ে দিলে। খানিকক্ষণ তা'রা তিন জন স্থির হয়ে বসে রইল, তারপরে বালক বলে উঠল—দেখেছ আজ রাত্রে এত জ্যোৎস্না মিছে নষ্ট হচ্ছে—এ ঘাসগুলো পর্য্যন্ত জ্যোৎস্নায় ভিজে উঠেছে। লোকটি বললে—ভাই, তোমাকে আমার ঝুলি দেখাব না ভেবেছিলাম কিন্তু তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে আমার স্বপ্ন দেখলে তোমার বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না। লোকটি ঝুলির মুখের দড়ি খুলতে লাগল আর নন্দিনী ঝুঁকে তার ভিতরে কি আছে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। ঝুলির ভিতর হাত দিয়ে সে একটি একটি করে স্বপ্ন তুলে দেখাতে

লাগল—কোনোটি পোখরাজের মত শাদা যেন চোখের জল জমাট বেঁধেছে, কোনোটি চুনির মত লাল যেন বুকের রক্ত দিয়ে রঙীন, কোনোটি নীল যেন আকাশের নীল চুরি ক'রে তাই দিয়ে তৈরী, কোনোটি সবুজ যেন পান্না। নন্দিনী বলল—এ দিয়ে তুমি কি করবে? লোকটি বললে—মালা গাঁথব। নন্দিনী বললে—সে মালাটি আমাকে দিও।

লোকটি বললে—না বোন, এ মালা তোমায় সাজবে না। বালককে দেখিয়ে বললে—এর চাইতে ভাল মালা এ তোমাকে একদিন গেঁথে দেবে—নন্দিনী উৎসুকভাবে বালকের মুখের দিকে তাকাল। বালক বললে—আমি ভাবছি এমন মালা আমি গাঁথতে পারব কি না। লোকটি বললে—পারবে ভাই, পারবে —তোমার কাছে জিনিস; আছে গেঁথে দিলেই হয়—নন্দিনীর মুখটি তুলে ধরে বললে,—দেখত এ গলায় তোমার মালা কেমন সার্থক হবে। বালক সলজ্জভাবে চেয়ে দেখলে নন্দিনীর গলাটি অতি সুন্দর। তারপর সেই লোকটি তার ঝুলি বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল, তাদের দুজনকার হাত ধরে বললে—চল এবার আমি তোমাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি, অনেক রাত হয়ে গেছে।

বনের বাইরে যখন তারা এসে দাঁড়াল, নন্দিনী ছেলেটিকে বললে—তুমি হচ্ছ বনদেবতাদের ছেলে কিনা, তাই তোমার আমাদের বাগানের সীমানার এদিকে আসা উচিত নয়—মালীরা যদি তোমায় দেখে তবে ধরে বন্ধ করে রাখবে—এই বলে সে চলে

যাচ্ছিল ; ফের ফিরে এল। বালকের সামনে এসে বললে—যদি তোমার ইচ্ছে করে আমাকে একটা চুমো খেতে পার। বালক নড়ল না। চুপ করে নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে রইল। নন্দিনী হেসে উঠল—যেন রূপোর ঘণ্টা বেজে উঠল, তারপর ছেলেটির গালে তার চাঁপার মত আঙ্গুল দিয়ে মৃদু আঘাত করে বললে—ওগো বন-দেবতাদের ছেলে, তুমি ভাই একটি পাগল। তারপর ছুটে বাগানের পথ দিয়ে ওধারে অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকটি জিজ্ঞাসা করলে—তুমি চুমো খেলে না কেন? বালক বললে—ওর চুমো আমাকে ঝলসে দিত। লোকটি বললে—ভাই, তুমি লোকালয়ের কাছে এসেছ, এবার তুমি নিজেই যেতে পারবে। আমার বাড়ী অনেক দূর, আমি এখন বিদায় হই। আমার এই বাঁশীটি তোমাকে দিলাম। কিন্তু তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, এই যে আকাশ দেখ, জ্যোৎস্না দেখ, ফুল দেখ, এর পেছনে এক মায়াবিনী আছে, সে যাকে অনুগ্রহ করে তার সর্ব্বনাশ হয়। একবার তাকে দেখলে রক্ষা নাই। কোন্ অবকাশে সে যে ভাল মানুষকে পাগল করে তার ঠিক নেই—হয়ত বা ফুলের গন্ধে উড়ে আসে, হয়ত বা সে দক্ষিণ বাতাসে ভেসে আছে। সে যখন আসে তখন পৃথিবী তার সমস্ত পত্র পুষ্প নিয়ে, তা'র ছয় ঋতু নিয়ে তার মোহিনী শক্তি বাড়িয়ে তোলে—বর্ষা যেন তার এলোচুলের কালো ছায়া, শরৎ যেন তার সোনালী মদের নীলপাত্র। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে সে

তোমায় দেখা দিয়েছে। যদি বুদ্ধিমান হও তবে জ্যোৎস্না রাতে বেড়াতে বেরিও না—পরী দেখবার আশায় বনে বনে ঘুরো না। কারণ, পরী নেই; রাজার মেয়ের সাথে ফুলবাগানে একলা দেখা কোরো না কারণ সে হচ্ছে রাজার মেয়ে, আর তুমি।

…আমি গরীবের ছেলে—কিন্তু আমি একদিন এমন মালা গাঁথব যে…

হায় রে সেই এক ভুল…সবারই একই ভুল—মায়াবিনী এত কচি বয়সে তোমাকে দেখা দিয়েছে যে তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা বৃথা। আসি ভাই—আবার এমনি রাতে বনের ভিতর হয়ত একদিন দেখা হবে।

বালক দেখলে, তার সঙ্গী ক্রমে ক্রমে গাছের নীচে দিয়ে অন্ধকার বনের মধ্যে চলে যেতে লাগল। একটা জায়গায় গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো তার মাথার উপরে এসে পড়ল, তার স্বপ্নের ঝুলিটার উপর এসে পড়ল। তারপর বনের অন্ধকারে আর তাকে দেখা গেল না।